স্বদেশে প্রবাসে কর্মসাধক

রেদওয়ানুল হক স্মারকগ্রন্থ

স্বদেশে প্রবাসে কর্মসাধক

স্বদেশে প্রবাসে কর্মসাধক

রেদওয়ানুল হক স্মারকগ্রন্থ

সম্পাদক

সৈয়দ নাহাস পাশা

দিয়া প্রকাশ

স্বদেশে প্রবাসে কর্মসাধক
রেদওয়ানুল হক স্মারকগ্রন্থ

সম্পাদক
সৈয়দ নাহাস পাশা

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
এম এ হক (এমলাক)

গ্রন্থস্বত্ব
রুফিয়া-রেদওয়ান ট্রাস্ট
www.rrtgiving.co.uk

প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০২৬

প্রকাশক
দিয়া প্রকাশ
রাজা ম্যানশন, তৃতীয় তলা, জিন্দাবাজার, সিলেট

প্রচ্ছদ : মলয় চন্দন সাহা
পরিবেশক : রকমারি ডটকম

মুদ্রক : প্যারাডাইম অফসেট প্রেস
রাজা ম্যানশন, তৃতীয় তলা, জিন্দাবাজার, সিলেট
মূল্য : ৬০০, £ 10

Swadeshe Probashe Kormoshadhok
Redwanul Hoque Smarakgrontho
Edited by Syed Nahas Pasha

Published by Diya Prokashon
Printed by Paradigm Offset Press.
Raja Mansion, 3rd Floor, Zindabazar, Sylhet

ISBN : 978-984-29104-1-8

সম্পাদকীয়

যুক্তরাজ্যে বর্তমানে বাংলাদেশি জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে ৭লাখ। যদিও এসম্পর্কে সঠিক কোনো পরিসংখ্যান নেই, ধারণা করা হয় এই সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে। তবে ২০২১ সালের আদমশুমারির তথ্য অনুযায়ী ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে বাংলাদেশি জনসংখ্যা ৬৪৪, ৯০০ জন যা এদেশের মোট জনসংখ্যার ১ দশমিক ১ ভাগ। এই জনগোষ্ঠী কিন্তু যুক্তরাজ্যকে তাদের নিজের দেশ হিসাবে মেনে নিয়েছে। ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের এখন চারপাঁচ প্রজন্মের বসবাস। নতুন প্রজন্মের ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের সাফল্যগাথা নিয়ে একটি বই লেখা যাবে। বিভিন্ন উচ্চতর পেশাজীবী নয়, এমপি-মন্ত্রী পর্যন্ত রয়েছেন। লন্ডন, বার্মিংহ্যাম, ওল্ডহ্যাম, ব্র্যাডফোর্ড, মানচেস্টার, লিডস, নিউক্যাসেল, কার্ডিফ ইত্যাদি শহরে ব্রিটিশ বাংলাদেশিরা বসবাস করছেন।

রেদওয়ানুল হক ১৯৫৯ সালে ৩০ বছর বয়সে যুক্তরাজ্যে আসেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ব্রিটেন নিউ কমনওয়েলথভুক্ত বিভিন্ন দেশ থেকে দেশগড়ার কাজে অনেক ইমিগ্র্যান্ট নিয়ে আসে। এর মধ্যে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের সিলেট অঞ্চলের, পাকিস্তানের পাঞ্জাব, কাশ্মীরের মিরপুর ও ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের লোকজনই বেশি। রেদওয়ানুল হক সেই প্রথম প্রজন্মের বাঙালি, যিনি ব্রিটেনে আসেন। খুবই কম বাঙালি জনসংখ্যা ছিল তখন। জীবন-জীবিকা নির্বাহ ছিল তাদের প্রধান উদ্দেশ্য এবং দেশে ফিরে গিয়ে আবার বসত গড়বেন। কিন্তু সেই জন্মভূমিতে ফিরে গিয়ে আর স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেননি ওই প্রজন্মের লোকজন। তবে তাঁদের মন পড়ে রয়ে গিয়েছিল তাঁদের মাতৃভুমিতে। তাঁরা একেবারে ভুলে যাননি বাংলাদেশকে। দেশের ভালো চেয়েছেন সবসময়। দেশের বিশেষ করে সিলেট অঞ্চলের যা কিছু উন্নয়ন ও অর্জন, এতে যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের অবদান সবচেয়ে বেশি। পরিবার-পরিজন বিলেতে নিয়ে এসেও প্রবাসীরা জন্মভূমিতে আত্মীয়স্বজনের সাথে যোগাযোগ রেখেছেন। এমনই একজন ছিলেন সিলেটের জগন্নাথপুর উপজেলার শ্রীরামসী গ্রামে জন্মগ্রহণকারী রেদওয়ানুল হক।

মরহুম রেদওয়ানুল হক ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান ও ধর্মপ্রাণ মুসলমান। কয়েকটি পরিবার নিয়ে সমাজ আর বিভিন্ন সমাজ নিয়ে হয় জাতি ও দেশ। রেদওয়ানুল হক পরিবার, সমাজ, জাতি ও দেশ—এই চারটির যথাযথ দায়িত্ব পালনে আন্তরিক ও সচেষ্ট ছিলেন। মানবদরদি ও জনসেবী হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি ছিল সকল মহলে। পারিবারিক সকল দায়িত্ব সুচারুভাবে সম্পন্ন করতেন; এর পাশাপাশি দেশ ও জাতির সেবায়ও তিনি অগ্রগামী ছিলেন।

আত্মমর্যাদা হচ্ছে যে-কোনো মানুষের মূল সম্পদ। নিজের, পরিবারের ও স্বজনদের সম্মান-সম্ভ্রম এবং অধিকার রক্ষা আত্মমর্যাদাবোধ থেকেই হয়। মরহুম রেদওয়ানুল হক এব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। আজীবন নিজ পরিবার ও গোত্রের মর্যাদা-অধিকার রক্ষার বিরামহীন আইনি লড়াই চালিয়ে গেছেন; এই আইনি যুদ্ধে বিজয়ীও হয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইসলামেও আত্মমর্যাদা, নিজের ও পরিবারের সম্মান-অধিকার রক্ষায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কবি কামিনী রায় বলেছেন, ‘আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে/আসে নাই কেহ অবনী প’রে/সকলের তরে সকলে আমরা/প্রত্যেকে মোরা পরের তরে।’ কবিতায় ব্যক্ত নীতিই ছিল রেদওয়ানুল হকের ব্রত। মানব ও সমাজসেবায় তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। ছিলেন ধর্মপরায়ণ এবং ন্যায় ও নীতিনিষ্ঠ। এই কীর্তিমানের জীবন-কর্মগাথা যাতে হারিয়ে না যায়, সেজন্য তাঁর জীবনালেখ্য নিয়ে এই স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করা হচ্ছে।

এই গ্রন্থে মরহুম রেদওয়ানুল হকের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে অনেকে স্মৃতিচারণমূলক লেখা দিয়েছেন। রেদওয়ানুল হকের বড়ো ছেলে এমদাদুল হক টিপু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাবার স্মৃতি লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে এই উদ্যোগ নিয়েছেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. আবুল ফতেহ ফাত্তাহ, বিশিষ্ট আইনজীবী হোসেন আহমদ, সাংবাদিক হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী, আ.ফ.ম. সাঈদ এবং প্যারাডাইম অফসেট প্রেসের কর্ণধার কবি শামস নূরের উপদেশ-পরামর্শে ঋদ্ধ হয়েছি। এছাড়াও অনেকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। রেদওয়ানুল হককে আল্লাহ রাহমানুর রাহিম জান্নাতুল ফেরদৌসের মেহমান হিসেবে রাখুন—এই দুআ করছি। আ-মিন।

সৈয়দ নাহাস পাশা

সূচি...

জীবনচরিত : মোহাম্মদ রেদওয়ানুল হক । ৯
Biography : Mohammad Redwanul Hoque । 19

গুণিজনের দৃষ্টিতে এক কর্মসাধক

রেদওয়ানুল হককে যেভাবে দেখেছি • হাফিজ আব্দুস শহিদ । ২৫
A man of impeccable character • Muquim Ahmed । ২৬
কারি লিজেন্ড বেঁচে থাকুন আমাদের অন্তরে • সৈয়দ নাহাস পাশা । ২৮
মো. রেদওয়ানুল হক অনন্য এক কর্মীপুরুষ, অক্ষয় এক কীর্তিগাথা • নবাব উদ্দিন । ৩৫
রেদওয়ানুল হক মানবিক নেতৃত্বের উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি • মুসলেহ উদ্দিন আহমেদ । ৪২
রেদওয়ানুল হক : শেকড়ের স্মৃতি • নজরুল ইসলাম বাসন । ৪৪
মুক্তিযুদ্ধ ও ভোটাধিকার আন্দোলনে রেদওয়ানুল হকের ছিল অনন্য ভূমিকা • মো. রহমত আলী । ৪৬
রেদওয়ানুল হক প্রবাসী সমাজের অগ্রপথিক ও অনুপ্রেরণার প্রতীক • শাহাগীর বখত ফারুক । ৪৮
রেদওয়ানুল হক মামা ও 'আকুব খাঁ' তালুকের মামলার ইতিবৃত্ত • মো. হাফিজুর রহমান চৌধুরী । ৫০
বাংলাদেশের স্বাধীনতার অনেক পূর্বে পূর্ব লন্ডনের ব্রিকলেন • আবদুল মুকিত । ৫৬
রেদওয়ানুল হক ছিলেন নিরলস সমাজসেবক • হারুণ মিয়া । ৫৮
রেদওয়ানুল হক সম্পর্কে দুটি কথা • সদরুল মাজীদ । ৬০
একজন সমাজসেবক আলহাজ মোহাম্মদ রেদওয়ানুল হক • জগলু মিয়া । ৬১
স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে চাচার অবদান • মো. মাহবুবুল হক শেরীন । ৬৩
Cherished memories • Cllr Atiqul Hoque । 65
A pious man • Hafiz Musleh Uddin Ahmed । 66

আপনজনের স্মৃতির আলোয়

আমাদের সময়, আমাদের জীবন • রুফিয়া বেগম । ৭৩
মরহুম আলহাজ রেদওয়ানুল হক (রাহ.) স্মরণে • মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম । ৭৮
রেদওয়ানুল হক ছিলেন একজন নিবেদিত সমাজসেবক • জেনিথ রহমান । ৮১
বেয়াই রেদওয়ানুল হক • মুমিনুর রহমান চৌধুরী । ৮২
Our Dear Redwan Bhai Shaheb • Foruk Rabbani । 85
পরিবার ও সমাজের একজন নির্ভরতার নাম • মো. গোলাম আহমদ শামীম । ৮৭

আমার চাচা • ছালেহা রহিম। ৮৮
চাচা রেদওয়ানুল হক • শাহনাজ আলেয়া, হাজেরা বেগম ও মুহিবুর রহমান (শহিদ)। ৯০
আমার স্মৃতির পাতায় • হাফিজ মো. মতিউল হক। ৯৩
পুত্রের স্মৃতিতে পিতা • এমদাদুল হক টিপু। ৯৫
শ্বশুর থেকে বাবা এক হৃদয়ের যাত্রা • রুমেনা জমজম চৌধুরী। ১০০
রেদওয়ানুল হক দাদা ছিলেন এক অনন্য মানুষ • আলেয়া বেগম। ১০৬
স্মৃতিচারণ : আলহাজ মোহাম্মদ রেদওয়ানুল হক • কবির আহমদ। ১০৮
স্মৃতির স্মরণে • মুহাম্মদ লুৎফর রহমান শিকদার। ১১০
একজন দানশীল ব্যক্তির স্মৃতিচারণ • অলিউর রহমান চাঁন মিয়া। ১১১
Esteemed individual • Shoyel Rashid Choudhury। 113
রেদওয়ানুল হক এক কিংবদন্তির নাম • এমলাকুল হক। ১১৪
এক মানবিক ব্যক্তিত্ব • মো. গোলাম রাসুল রিমন। ১১৯
মেজো চাচা স্মরণে • মো. আহসানুল হক লিপু। ১২০
আমাদের নানাছাব • ডলি, লিলি ও মিজান। ১২২
My Abba • Halima Khatun (Mukta)। 123
আমাদের মেজো দাদা • নিশাত তাসনিম প্রমি ও ফারিহা তাসনিম ঐশী। ১২৬
My Dada A leader within the wider community • Mohammed Emjadul Hoque Mahdi। 129
My Memory of my Dada Through a Child's Eyes • Mahira Asma Hoque। 134
Memory of My Nana • Sharier Khadim Mihad। 137
এক আলোকবর্তিকার গল্প • এমদাদুল হক টিপু। ১৩৮

মামলার পাতা এক জীবনের ধৈর্য্য

একটি ঐতিহাসিক মামলা নিষ্পত্তিতে পঞ্চাশ বছর • হোসেন আহমদ। ১৪৩

জীবনচরিত

মোহাম্মদ রেদওয়ানুল হক

(১৯৩০-২০১০ খ্রিষ্টাব্দ)

১৯৩০ সালের ৪ মার্চ সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার শ্রীরামসি গ্রামের দিঘিরপারে রেদওয়ানুল হকের জন্ম।

সবুজ গাছগাছালি, লতাপাতা, আর পূর্ব ও পশ্চিমে পুকুর, মধ্যখানে টিনশেডের একটি বাড়ি। বাবা মৌলভি মোহাম্মদ মাহফুজুল হক আর মা মোছাম্মাৎ আমিরুন নেসা। নয় ভাই-বোনের মধ্যে রেদওয়ানুল হক ছিলেন ষষ্ঠ।

পিঠাপিঠি চার ভাই লোকমানুল হক, লোমানুল হক, সুলেমানুল হকের সঙ্গেই সব গল্প, সব খেলা, সব কথা। বড়ো বোন আলতা বিবি, আতিকা খাতুন, খালিসা খাতুন, সুলতানারা খাতুন, ছোটো বোন মায়া বিবি। ছোটো থেকেই মাঠে দৌড়ানো, খালে-বিলে মাছ ধরা, সাঁতার কাটা আরও কত কি। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে কিছুদিন একটি মাদ্রাসায় পড়েন। অতঃপর পড়াশোনা বাদ দিয়ে ছোটোবেলা থেকেই তিনি জীবনযুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং ১৯৪৭ সালে সতেরো বছর বয়সে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর রাজনৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর শ্রমিক সংগঠনে যোগদান করেন।

১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত রেদওয়ানুল হক চট্টগ্রাম, কলকাতার খিদিরপুর, আসামের তেজপুর ও হোজাই এবং পরে শিলংয়ে অবস্থান করে বিভিন্ন কাজ করেন। অতঃপর ১৯৫৯ সালে ত্রিশ বছর বয়সে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের লেবার ভিসা নিয়ে ভারত হয়ে বিলেতে যান। সেখানে তাঁর খালাতো ভাই মনির মিয়ার সহযোগিতায় পূর্ব লন্ডনের ৪৩ সেটেল স্ট্রিটে বসবাস করেন ও রেস্টুরেন্টে কাজ করেন। তিনি কিংসক্রস এলাকায় একটি রেলওয়ে স্টেশনেও কাজ করেন। অতঃপর

সেখান থেকে তিনি বার্মিংহ্যামে চলে যান। বার্মিংহ্যামে একটি ফাউন্ড্রিতে দুই বছর চাকরি করার পর ভিলস্টোন চাংকি ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির মোটর স্টেশনে পাঁচ বছর চাকরি করেন। তিনি বার্মিংহ্যামে বাড়ি ক্রয় করে সেখানে বসবাস করতেন।

রেদওয়ানুল হক ১৯৬৬ সালে নভেম্বর মাসে নিজ দেশে আসেন। ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসে বিয়ে করেন। তাঁর স্ত্রীর নাম রুফিয়া বেগম। তিনি সম্পর্কে চাচাতো বোন হন। পরিবারের ইচ্ছায় তাঁদের বিয়ে হয়। বিয়ের আট মাস পর তিনি তাঁর কর্মস্থল লন্ডনে চলে যান। তাঁর দুই পুত্র এমদাদুল হক টিপু ও এমলাকুল হক এবং দুই কন্যা সালমা খাতুন রিক্তা ও হালিমা খাতুন মুক্তা। তারা সবাই যুক্তরাজ্যে সপরিবারে বসবাস করছেন এবং সকলেই সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি নিজের সন্তানদের একাডেমিক ও পারিবারিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধে শিক্ষিত করেছেন।

রেদওয়ানুল হক বার্মিংহ্যামে কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকলেও তাঁর মন পড়ে থাকত বাঙালি কমিউনিটির লোকজনের সাথে। অধিকাংশ বাঙালি পূর্ব লন্ডনের ব্রিকলেন এলাকায় বসবাস করতেন। তাঁরা সেখানে বিভিন্ন দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য আন্দোলন ও সমাবেশ করতেন। তাই তিনি বিবেকের তাড়নায় বার্মিংহ্যাম থেকে ব্রিকলেনে চলে আসেন। তিনি ব্রিকলেনের সন্নিকটে ২ নম্বর ক্যাসন স্ট্রিটে থাকার ব্যবস্থা করেন এবং ধীরে ধীরে বাঙালি কমিউনিটির সঙ্গে যোগ দিয়ে শীর্ষ নেতৃবৃন্দের সান্নিধ্য লাভ করেন। তিনি সেখানকার বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন।

রেদওয়ানুল হক ১৯৬৭ সালের শেষের দিকে তদানীন্তন পাকিস্তান ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হন। তিনি এই সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ও পরবর্তীকালে কার্যকরী পরিষদের সদস্য মনোনীত হন এবং সমাজসেবামূলক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা গৌস খান, হাজি নেসাওয়ার আলী, আব্দুল মতলিব চৌধুরী, দেওয়ান মনফর আলী, মতিউর রহমান, শামসুর রহমান, তৈয়বুর রহমানসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রবাসী বাঙালি কমিউনিটির স্বার্থে কাজ করেন।

রেদওয়ানুল হক ১৯৬৮ সালের প্রথমদিকে ব্রিকলেনের হ্যানবারি স্ট্রিটে 'সোনার বাংলা' নামে বাঙালি রেস্টুরেন্ট প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬৯

সালে রেস্টুরেন্টটি পুরোপুরি চালু হয়। সে সময় পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের অর্থাৎ, তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের সম্পর্ক ভালো ছিল না। একপর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ, বাংলাদেশের জনগণ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধিকার আন্দোলনের দিকে ধাবিত হয়। প্রবাসীরা এই আন্দোলনের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করেন এবং আন্দোলনে যোগ দেন। এই আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে 'সোনার বাংলা' রেস্টুরেন্ট ছিল প্রবাসী বাঙালিদের আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। আওয়ামী লীগের শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দসহ প্রবাসে অবস্থানরত বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ এখানে জড়ো হতেন। মিটিং করতেন, সিদ্ধান্ত নিতেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অসহায় মানুষের জন্য এবং ভারতে আশ্রিত এক কোটি শরণার্থীর জন্য প্রবাসী বাঙালিরা তাদের নিজেদের বেতনের টাকাসহ আর্থিক অনুদান বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর মাধ্যমে তৎকালীন অস্থায়ী সরকার বরাবরে পাঠাতেন এবং সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করতেন। তাঁরা নিরস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অস্ত্র কিনে তা দেশে পাঠাতে সক্ষম হন। আর এসব কাজে অন্যদের সাথে রেদওয়ানুল হক অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। লন্ডনের সংঘবদ্ধ কমিউনিটি নেতারা সমগ্র ইউরোপজুড়ে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেন। তাঁরা বিশ্বজনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে নানান উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সে সময় গ্রেট ব্রিটেনের সর্বস্তরের প্রবাসী বাঙালিরা এই আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। পাকিস্তানি বর্বর হানাদার বাহিনী সারা দেশের ন্যায় শ্রীরামসির সেই অজপাড়া শান্ত-স্নিগ্ধ গ্রামটিতেও ৩১ আগস্ট ১৯৭১ সালে আক্রমণ চালায়। তারা 'শান্তি কমিটি' গঠনের নামে গ্রামের শিক্ষিত ও মেধাবী লোকদের ডেকে এনে হাইস্কুলের সামনে সারিবদ্ধভাবে হাত বেঁধে গুলি করে হত্যাযজ্ঞ চালায়। তারা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছাদ উদ্দিনসহ শতাধিক নিরীহ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে। বাড়িঘর, বাজার, স্কুল, অফিস জ্বালিয়ে দিয়ে ইতিহাসের এক বর্বরতম কালো অধ্যায় সৃষ্টি করে। সেই দুঃসময়ের মুহূর্তটি চিরজাগ্রত থাকবে শ্রীরামসি গ্রামবাসীর হৃদয়ে অনন্তকাল ধরে। গ্রামবাসী আজও শ্রদ্ধার সাথে ৩১ আগস্ট দিবসকে আঞ্চলিক শোক দিবস হিসেবে পালন করে আসছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে ৩০ লক্ষ বাঙালি আত্মাহুতির এক বিশাল অংশীদার প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী এই

গ্রাম। রেদওয়ানুল হক তাঁর জন্মস্থানের সেই বীভৎস, জঘন্যতম ও নির্মম গণহত্যার কথা ভুলতে পারেননি। সে সময় তাঁর ছোটো ভাই লোমানুল হক ও ভাগনে ফারুক মিয়া তাঁর সাথে লন্ডনে ছিলেন। তাঁদের মন ও হৃদয় তখন দেশে পড়ে থাকত। কখন কী হয় এই ভেবে আতঙ্কে থেকে তাঁরা দুঃসময় অতিবাহিত করতেন। যুদ্ধ চলাকালীন তাঁর মা আমিরুন নেসা বয়োবৃদ্ধ ও অসুস্থ ছিলেন। তিনি বাড়িতেই থাকতেন। বড়ো ভাই লোকমানুল হক ও ছোটো ভাই সুলেমানুল হক মায়ের সঙ্গেই থাকতেন। ভাগ্যিস সেদিন আল্লাহর কৃপায় তাঁরা সবাই প্রাণে রক্ষা পান।

শ্রীরামসি আক্রান্ত হওয়ার পর রেদওয়ানুল হক স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেকে আরও জড়িয়ে ফেলেন এবং তাঁর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের আয়ের একটি বড়ো অংশ দেশে পাঠাতে থাকেন। সে সময় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের একজন বাঙালি হিসেবে 'সোনার বাংলা রেস্টুরেন্ট' নামকরণ করে ব্যবসা পরিচালনা করা দুঃসাহসের বিষয় ছিল, তিনি তা করেছেন। তাঁর রেস্টুরেন্ট সে সময় প্রবাসী বাঙালিদের একটি মিলনকেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। সবাই এখানে এসে সুখ-দুঃখের খবরাখবর নিতেন এবং ভাব বিনিময় করতেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ধন্যবাদ, তাঁর লেখা এই দেশকে ভালোবাসার গান 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' সার্থকতা লাভ করেছে। যা বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের মননে, গহিনে, হৃদয়ে এক উজাড় করা ভালোবাসার স্বীকৃতি হিসাবে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতে পরিণত হয়েছে। আর রেদওয়ানুল হক সাহসের সাথে এক ভয়াবহ ও দুঃসময়ে তাঁর রেস্টুরেন্টের এই নামকরণে দেশপ্রেমের এক উজ্জ্বল ও অনন্য নজির স্থাপন করেন।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদের অন্যতম সদস্য আব্দুস সামাদ আজাদ, তাজ উদ্দিন আহমেদ, জেনারেল এমএজি ওসমানী, দেওয়ান ফরিদ গাজী, জনমানুষের নেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, ফণী মজুমদার প্রমুখ সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতৃবর্গ লন্ডনে গেলে তাঁরা 'সোনার বাংলা রেস্টুরেন্ট' পরিদর্শন করেন। রেদওয়ানুল হক গর্বিতভাবে তাঁদেরকে সাদরে অভ্যর্থনা প্রদান করেন এবং কৃতজ্ঞতা জানান।

রেদওয়ানুল হক বিভিন্ন সমাজসেবামূলক সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। বিশেষ করে যুক্তরাজ্যস্থ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী

পরিষদের সদস্য, ব্রিকলেন মসজিদ কমিটির সদস্য ও ট্রেজারার ছিলেন। তিনি ওসমানী স্কুলের সদস্য, বাংলাদেশ সেন্টারের আজীবন সদস্য, সিলেট ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য, ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য, বাংলা স্কুলের গভর্নর ও কার্যকরী কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি ল' সেন্টার তৈরির আন্দোলনেও জড়িত ছিলেন। তিনি প্রবাসী সুরত মিয়া হত্যা বিচারের দাবিতে গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন।

১৯৭৬ সালে বঙ্গবীর জেনারেল এমএজি ওসমানী লন্ডনে গেলে সোনার বাংলা রেস্টুরেন্টে যান এবং এর ওপরতলায় কিছুদিন অবস্থান করেন। এই সময় ম্যানচেস্টারের আব্দুল মতিন চৌধুরী, সাবেক গণপরিষদ সদস্য আব্দুল মন্নান চৌধুরী সানু মিয়া, আওয়ামী লীগ নেতা তৈয়বুর রহমানসহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ওসমানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সে সময় লন্ডনে জেনারেল এমএজি ওসমানী তাঁর প্রতিষ্ঠিত জাতীয় জনতা পার্টির লন্ডন শাখা উদ্বোধন করেন। রেদওয়ানুল হক প্রথমে জাতীয় জনতা পার্টির অ্যাডভাইজারি বোর্ডের সদস্য হন। পরে তিনি জাতীয় জনতা পার্টির সক্রিয় কর্মী হিসাবে কাজ করেন এবং ওসমানীর সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে তিনি জাতীয় জনতা পার্টির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক হয়েছিলেন।

জাতীয় জনতা পার্টির নেতৃবৃন্দের সাথে রেদওয়ানুল হকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। পার্টির অন্যতম সদস্য ও সভাপতি সাবেক এমপি অ্যাডভোকেট নুরুল ইসলাম খান তাঁর খুব প্রিয়ভাজন ছিলেন। তাঁর সাথে পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে ওঠেছিল। সিলেটের নেতৃবৃন্দের মধ্যে অ্যাডভোকেট দেবতোষ চৌধুরী, অ্যাডভোকেট খন্দকার মবশ্বির আলী, অ্যাডভোকেট আব্দুল মতিন চৌধুরী প্রমুখের সঙ্গে তাঁর সখ্য ছিল। তিনি তাঁদের সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন। তাঁর ফুফাতো ভাই *দৈনিক সিলেট বাণী*র সম্পাদক মোহাম্মদ জাহিরুল হক চৌধুরী ও আত্মীয় বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা কবি আবুল বশরকে নিয়ে তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও সেবামূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন।

১৯৯৪ সালে প্রবাসীদের ভোটাধিকারের দাবিতে আন্দোলন শুরু হলে তিনি এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।

মূলত ১৯৭৬ সালে জেনারেল ওসমানীর নেতৃত্বে প্রবাসীদের ভোটাধিকারের দাবির আন্দোলন শুরু হয়। যা পরবর্তীকালে ব্যাপক আকার ধারণ করে। রেদওয়ানুল হক ১৯৯৫ সালের ২৬ মার্চ প্রবাসীদের ভোটাধিকার দাবির প্রার্থনায় সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি রিট পিটিশন ফাইল করেন। যার নম্বর ২৪৮৬/১৯৯৫। বিচারপতি বিমলেন্দু বিকাশ রায় চৌধুরী ও বিচারপতি আব্দুল মন্নান সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চে শুনানিকালে সরকারের পক্ষে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট হাসান আরিফ প্রথমদিকে সময় প্রার্থনা করেন। পরবর্তীকালে শুনানি শেষে রিট খারিজ হয়। রেদওয়ানুল হক এই খারিজ আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের শরণাপন্ন হয়েও ব্যর্থ হন। আবেদনকারীর পক্ষে শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন ব্যারিস্টার রওশন আলী, অ্যাডভোকেট নিতাই রায় চৌধুরী, অ্যাডভোকেট নুরুল ইসলাম খান, ব্যারিস্টার শামসুর রহমান, অ্যাডভোকেট খালেদ বিজলী। এ সময় তাঁর সঙ্গে আদালতে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় জনতা পার্টির সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর রহমান হিরু ও অন্য নেতৃবৃন্দ।

রেদওয়ানুল হক প্রবাসী ব্যবসায়ীদের সিআইপি (কমার্শিয়াল ইম্পোর্টেন্ট পারসন) স্বীকৃতি দাবি করেন এবং হয়রানি ও ভীতিমুক্ত ব্যবস্থায় প্রবাসীদের দেশে রেমিট্যান্স পাঠানোর দাবি করেন। তিনি সহজ ব্যবস্থায় সকল জটিলতা দূর করে পাসপোর্ট প্রদানের দাবি জানান। তিনি বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস জটিলতার অবসান চেয়ে আন্দোলন করেন।

রেদওয়ানুল হক গ্রামের মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন। বিশেষ করে অসহায় গরিব মানুষদের তিনি সাহায্য করতেন। তারা তাদের যে-কোনো সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনে তাঁর সহযোগিতা পেত। তিনি তাঁর আত্মীয়স্বজনদের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখতেন। সকলের পরিবারের খোঁজখবর নিতেন। যে কারো আর্থিক প্রয়োজনে সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতেন। তিনি তাঁর অবস্থান থেকে মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল ও রাস্তাঘাট উন্নয়নে ও নির্মাণে মুক্ত হস্তে দান করতেন। তিনি সবসময় নিজের পরিবার, পাড়াপ্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন ও গ্রামের মানুষদের নিমন্ত্রণ করতেন। ভালো খাবার দাবারের আয়োজন করতেন। তিনি এসব

কাজ করে আনন্দিত হতেন। লন্ডনে যে কেউ তাঁর সহযোগিতা চাইলে তিনি হাসিমুখে তাকে সহযোগিতা করতেন। কাজের ব্যবস্থা করে দিতেন।

রেদওয়ানুল হক অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ছাড়াও নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তেন। তসবিহ ও তেলাওয়াত করতেন। জিকির-আজকারে মশগুল থাকতেন। আল্লাহর ওয়াস্তে দান-খয়রাত করতেন। মসজিদের খেদমতে থাকতেন। পির, মাশায়েখ ও আলিম-ওলামাদের সম্মান করতেন। তাঁদের সাথে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তিনি প্রায় সময়ই তাঁর বাড়িতে তাদের নিমন্ত্রণ করতেন; খেদমত করতেন। শুধু আলিম ওলামা নয়, তাঁর বাড়িতে এলাকার রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়সহ যে-কোনো আয়োজনে আগত অতিথিদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হতো। অতিথি আপ্যায়নে তিনি এবং তাঁর সকল ভাই ছিলেন অত্যন্ত সুদক্ষ ও আন্তরিক। উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিম আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী সাহেব, জাতীয় নেতা আব্দুস সামাদ আজাদ, মুক্তিযুদ্ধের বীর সৈনিক বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকীসহ বিশিষ্টজনেরা তাঁর বাড়িতে তাঁর আতিথেয়তায় মুগ্ধ ছিলেন। হাফিজ আব্দুস শহিদ তাঁর অত্যন্ত প্রিয়জন ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন মসজিদের ইমাম হিসেবে তাঁদের বাড়িতে ছিলেন। তিনি বাড়ির বাংলোঘরে থাকতেন। তাঁর কাছে হাফিজি পড়তে অনেক ছাত্র আসত। হাফিজ আব্দুস শহিদ তাদেরকে পড়াতেন। এক সময় বাংলোতে জায়গা সংকুলান না হওয়ায় তা মসজিদ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। পরবর্তীকালে গ্রামবাসীর সহযোগিতায় হাফিজিয়া ফুরকানিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন এই মাদ্রাসাটি সুপ্রতিষ্ঠিত। এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় রেদওয়ানুল হকের বিশেষ অবদান ছিল।

রেদওয়ানুল হক সালিশি ব্যক্তিত্ত্ব ছিলেন। তাঁর বাংলোঘরে প্রায় সময় সালিশ বসত। এলাকার বিশিষ্ট সালিশি ব্যক্তিবর্গ এখানে উপস্থিত থেকে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। তিনি ছোটোবেলায় ভালো ফুটবলারও ছিলেন। ক্রীড়াঙ্গনে তাঁর নামডাক ছিল। নিজ এলাকা ছাড়াও তিনি চট্টগ্রাম, কাপ্তাই, রাঙামাটি প্রভৃতি স্থানে হায়ারে গিয়ে ফুটবল খেলায় অংশ নিয়েছেন।

রেদওয়ানুল হক লেখাপড়ায় এগোতে না পারলেও তাঁর মেধা ও বিচক্ষণতা প্রখর ছিল। তিনি সবার সঙ্গে তাঁর যোগ্যতা দিয়ে চলতে

পারতেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। তাঁর চলাফেরার ধরন, কথা বলার ধরন অনুকরণীয় ছিল। তিনি তাঁর বাবা ও চাচাদের অনুসরণ করতেন। তাঁর বাবা মৌলভি মোহাম্মদ মাহফুজুল হক আরবি, ইংরেজি ও ফারসি ভাষায় যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন। তিনি স্কুলে ও মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেছেন। গ্রাম্য সালিশ ও পঞ্চায়েতে তাঁর ও তাঁর অপর তিন ভাই মৌলভি মশহুদুল হক, মৌলভি মাহমুদুল হক, মৌলভি মছফুল হকের সুনাম ছিল। তাঁরা সবাই আরবি ও ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। তাঁর দাদা মৌলভি কামিল মোহাম্মদও বাংলা ও আরবি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। এককথায় তাঁর পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ সবারই সুখ্যাতি ছিল। তাঁর মাতা আমিরুন্নেছার সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম। তিনি ধার্মিক ও মহিয়সী মহিলা ছিলেন।

রেদওয়ানুল হকের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ এবং তদূর্ধ্ব বংশধরগণ ছিলেন সহজ-সরল প্রকৃতির। তাঁরা সে সময় আরবি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন এবং নিরহংকার ও নির্লোভ ছিলেন। তাঁদের কারো কোনো উচ্চাভিলাষ ছিল না। তাঁরা ঝামেলামুক্ত সুন্দর জীবনযাপনে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। কিন্তু রেদওয়ানুল হক ছিলেন একটু ব্যতিক্রম। তিনি তাঁর প্রাপ্য ও অধিকার হতে বঞ্চিত থাকতে পারছিলেন না। তিনি এই বিষয়ে খুব ভাবতেন। তাই তিনি তাঁর অধিকার আদায়ে বরাবরই সোচ্চার ছিলেন। বাড়ির সামনের দিঘিটি পার্শ্ববর্তী খাঁ বাড়ির লোকেরা তাদের একক সম্পত্তি হিসেবে দাবি করে তা ব্যবহারে তাদেরকে বাধা দিত। তাদের এই বাধা রেদওয়ানুল হক মেনে নিতে পারেননি। সে কারণে তারা তিনি ও তাঁর ভাই লোকমানুল হক, সুলেমানুল হক ও মনির মিয়ার বিরুদ্ধে ফৌজদারি আদালতে একাধিক মামলা করে। এসব মামলায় রেদওয়ানুল হক ১ নম্বর আসামি/প্রতিপক্ষ থাকতেন। সব মামলা থেকে তাঁরা অব্যাহতি পান। রেদওয়ানুল হক চাইলে তাদের বিরুদ্ধেও মামলা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি কোনো মামলা করেননি। উভয়পক্ষের বিরোধ নিরসনে এলাকার বিশিষ্ট সালিশ ব্যক্তিত্ব ও মুরুব্বি সাজিদ মিয়াসহ এলাকার অনেকে এই বিরোধ নিরসনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অতঃপর রেদওয়ানুল হক অনেক ভেবেচিন্তে তাঁর পরিবার ও বংশধরদের সিদ্ধান্ত নিয়ে আতুয়াজান পরগনার অন্তর্গত শ্রীরামসি মৌজার ২৩৪১৮ নম্বর

দর্শনাতালুক আকুব খাঁ মহাল সম্বন্ধীয় থাক জরিপি ৪০১২ নম্বর থাকের ৫৭/১০৭/১১৬ ও ১৩১ নম্বর চকের জরিপি ভূম্যাদির মধ্যে নালিশা তালুকের মালিক দাবি করে বর্ণিত জরিপকালে দখলকার হিসাবে তেরো ব্যক্তির মধ্যে নয় জনের এবং দুই জনের অংশের ভূমি খরিদ সূত্রে অর্থাৎ, মোট সম্পত্তির তেরো ভাগের এগারো অংশ মালিকানা দাবি করে এই ভূমির এক পৃথক ছাম পাওয়ার এবং ছামের ভূমিতে খাস দখল পাওয়ার মর্মে সাবজজ প্রথম আদালত সিলেটে ১৩৪/১৯৭৫ খ্রি. নম্বর স্বত্ব বাঁটোয়ারা মোকদ্দমা দায়ের করেন। যা দীর্ঘ বিচারকার্য শেষে ৫০ বছর পর স্বত্ব জারি মোকদ্দমা নম্বর ১/২০০৭ খ্রি. মূলে প্রার্থিত মতে গত ২০-০৫-২০২৫ তারিখে মোকদ্দমার বাদিগণ মোট সম্পত্তির তেরো ভাগের নয় অংশে ২২.৭২ একর এক পৃথক ছামের ভূমি খাস দখল সরেজমিনে পান। রেদওয়ানুল হক এই মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি দেখে যেতে পারেননি। তবে চূড়ান্ত ডিক্রি দেখে যেতে পেরেছেন। এই মামলার কারণ মূলত বংশমর্যাদার অন্যতম একটি ইস্যু ছিল। এই বিষয়ে এই গ্রন্থে পৃথক একটি লেখা রয়েছে। এই বিষয়টি উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে—তিনি যেমন ছিলেন পরোপকারী, সমাজসেবী তেমনি ছিলেন জেদি ও আত্মবিশ্বাসী। তিনি তাঁর কার্য দ্বারা সত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। হৃত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করতে পেরেছেন। তিনি তাঁর জীবনযুদ্ধেও অদম্য ছিলেন। প্রথমদিকে নানা প্রতিকূলতা বাধাবিপত্তি তাঁকে থামিয়ে দিতে পারেনি। অনেক কষ্টে চড়াই-উতরাইয়ের পর তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। নিজ পরিবার, আত্মীয়স্বজন কাউকেই তিনি ভুলেননি। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন সামাজিক কর্মকাণ্ডে। নিজ পরিবারের ছোটোবড়ো সকলের প্রতি তাঁর খেয়াল ছিল। শুধু তা-ই নয়, তাঁর বংশের ও প্রতিবেশীদের মধ্যে যারা লেখাপড়া করতেন তাদেরকে তিনি উদারহস্তে নানানভাবে সহযোগিতা করতেন। যারা অভাবগ্রস্ত ও ঋণগ্রস্ত থাকতেন তাদেরকেও মুক্তভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। তিনি অনেক বড়ো আত্মার ব্যক্তিত্ব ছিলেন। অধিক হারে দান করতে ও খরচ করতে পছন্দ করতেন।

রেদওয়ানুল হক ছিলেন খাঁটি দেশপ্রেমিক। সমাজসেবা ও প্রবাসী আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত। প্রবাসে থেকেও তিনি সবসময় দেশের রাজনীতি, সমাজ ও উন্নয়নের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ১৯৮৯

সালে তাঁর স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের লন্ডনে নিয়ে যান। তারা লন্ডনে যাওয়ার পর তিনি অনেকটা মুক্ত বিহঙ্গের মতো বেশি করে দেশে আসা-যাওয়ার সুযোগ পান। তাঁর আসা-যাওয়ার অন্যতম কারণ ছিল উল্লিখিত মোকদ্দমা।

রেদওয়ানুল হক ১৯৭৮ সালে সিলেটের বন্দরবাজারের লালবাজারে 'সোনার বাংলা' নামে সিলেটে অত্যাধুনিক রেস্টুরেন্ট খোলেন, যা অনেক দিন চালু ছিল। তিনি সে সময় শাহপরান (রহ.) এলাকায় অনেক ভূমি নিয়ে কৃষিকাজ করাতেন। তাঁর জীবনযাপন যথেষ্ট সাদামাটা হলেও তিনি শৌখিন ছিলেন। অসীম ধৈর্যের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহর প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি তাঁর কর্ম ও পরিশ্রম দ্বারা জীবনে সফলতা লাভ করেন। তিনি তাঁর বংশের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার জন্য যেমনিভাবে আজীবন লড়াই করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার উন্নয়ন ও সংস্কারে কাজ করেছেন।

সকল মানুষের প্রতি ছিল তাঁর আন্তরিক ভালোবাসা। জীবনের অন্তিম পর্যায়ে এসেও তিনি তাঁর জীবনের অসমাপ্ত অনেক কাজ করতে না পারার বেদনায় চরমভাবে ব্যথিত হয়েছেন। তিনি সমস্ত জীবন তাঁর সেই লক্ষ্য পথেই অগ্রসর হয়েছেন। তিনি ছিলেন সমাজের ও পরিবারের এক আলোকবর্তিকা।

২২ মার্চ ২০১০ সালে ৮০ বছর বয়সে সামান্য রোগভোগের পর লন্ডনে তাঁর মৃত্যু হয়। সেখানে জানাজার পর তাঁর মরদেহ দেশে আনা হলে হাজারো মানুষের অশ্রুতে ও ভালোবাসায় সিক্ত হয়। সর্বস্তরের মানুষ ও জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে জানাজার নামাজ ঐতিহাসিক বাজার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি সমাহিত আছেন তাঁর প্রিয় বাবা মা-র কবরের পাশে।

রেদওয়ানুল হক মৃত্যুর ওপারে চলে গেলেও তাঁর কর্ম তাকে বাঁচিয়ে রাখবে অনন্তকাল। আজও তিনি অহংকার হয়ে আছেন সকলের মাঝে।

সংকলনে : হোসেন আহমদ, অ্যাডভোকেট

Biography

Mohammad Redwanul Hoque

1930-2010 AD

Redwanul Hoque was born on March 4 1930, into a respected family in Dighirpar, Sriramsi, Jagannathpur Upazila, Sunamganj. His father was Maulvi Mohammad Mahfuzul Hoque, and his mother was Mosammat Amirun Nesa. Redwanul Hoque was the sixth of nine siblings.

The four brothers are Lukmanul Hoque, Lumanul Hoque, Sulemanul Hoque, and Redwanul Hoque. The sisters are the elder sister Alta Bibi, Atika Khatun, Khalisa Khatun, Sultanara Khatun, and the younger sister Maya Bibi. After finishing his primary school education, he studied at a madrasa. Then, in 1947, at the age of seventeen, he joined the workers' organisation of Maulana Abdul Hamid Khan Bhasani, inspired by his political ideology.

From 1949 to 1959, Redwanul Hoque held various jobs in Chittagong, Khidirpur in Kolkata, Tezpur, Hojai in Assam, and later in Shillong. In 1959, at the age of 30, he arrived in the United Kingdom via India on a labour visa obtained from the UK Employment Exchange. With the assistance of his cousin Monir Mia, he began living at 43 Settle Street in East London and started working in a restaurant. He also found work at King's Cross railway station. Subsequently, he moved to Birmingham. After working in a foundry for 2 years, he spent 5 years at an engineering company. He purchased a house in Birmingham and lived there.

Redwanul Hoque returned to his homeland in November 1966. He married in April 1967. His wife's name was Rufia Begum, his cousin. It was an arranged marriage by the family. After eight months of marriage, he came back to London.

Redwanul Hoque brought his family to the UK in 1989. He has two sons, Emdadul Hoque Tipu and Amlakul Hoque, and two daughters, Salma Khatun Rickta and Halima Khatun Mukta. All live in the UK with their families and are well-established. He educated his children, and they respect family values and religious and moral principles.

Although Redwanul Hoque was working in Birmingham, his heart remained with the Bengali community in the East End. The Bengalis organised protests and rallies there to establish their rights. Consequently, he moved from Birmingham to Brick Lane, driven by his conscience, and gradually established connections with the leading figures of the Bengali community. He worked in various factories.

Redwanul Hoque joined the Pakistan Welfare Association in late 1967. At one point, he was appointed as the organisation's general secretary and later served on the executive committee. He teamed with prominent community leaders such as Ghaus Khan, Haji Nesawar Ali, Abdul Matlib Chowdhury, Dewan Manfar Ali, Matiur Rahman, Shamsur Rahman, Taibur Rahman, and others to advance the interests of the expatriate community.

Redwanul Hoque opened a Bengali restaurant called 'Sunar Bangla' on Hanbury Street, next to Brick Lane, in early 1968. In 1969, relations between Pakistan and Bangladesh, then known as East Pakistan, were strained. The people of East Pakistan, now Bangladesh, started an independence movement under the leadership of Bangabandhu. The expatriates showed solidarity with this movement and actively supported it. During that period, the 'Sunar Bangla' restaurant became a shared gathering place for expatriate Bengalis. Leaders of the Bangladeshi community held meetings there. Redwanul Hoque played a key role in various activities, including raising funds for Bangladesh during the Liberation War.

There was a sombre moment for Redwanul on August 31, 1971. During the liberation war in 1971, the invading Pakistani army invited the talented villagers of Sriramsi to form a Peace Committee. They tied their hands in a row in front of the high school and shot them dead. They also destroyed houses, markets, schools, and offices, leaving a brutal chapter in

history. That tragic moment remains etched in the hearts of the Sriramsi villagers forever. The villagers still observe August 31 as a day of mourning with respect. Redwanul Hoque could never forget the horrific, heinous, and brutal massacre in his own village.

After Sriramsi was attacked, Redwanul Haque became more involved in Bangladesh's freedom movement and sent a significant portion of his business income to the country. Additionally, Redwanul Hoque bravely set a unique example of patriotism by naming his restaurant "Sunar Bangla" during a trying and challenging period. After Bangladesh gained independence, leaders such as Abdus Samad Azad, Taj Uddin Ahmed, General MAG Osmani, and Dewan Farid Gazi visited the 'Sunar Bangla Restaurant' on various occasions.

Redwanul Hoque was involved with various community organisations. In particular, he was a member of the executive committee of the Bangladesh Welfare Association and the asst. treasurer of the Brick Lane Mosque Committee. He was a member of Osmani School, a life member of the Bangladesh Centre, a member of the Greater Sylhet Development Council, a member of the Bangladesh Caterers Association, and a governor and member of Bangla School. Additionally, he was involved in establishing Tower Hamlets Law Centre. He also actively participated in the central committee formed to seek justice for the murder of expatriate Surat Mia at the airport in Dhaka.

In 1976, when Bangabir General M A G Osmani came to London, he visited the Sunar Bangla restaurant and stayed on its upper floor for a few days. During this time, many prominent individuals, including Abdul Matin Chowdhury of Manchester, former MLA Abdul Mannan Chowdhury Sanu Mia, and community leader Tayabur Rahman, met Osmani. At that time, General M A G Osmani launched his UK branch of the Jatiya Janata Party. Redwanul Hoque first joined the Advisory Board of the Jatiya Janata Party. Later, he worked as an active member of the Jatiya Janata Party and developed a close relationship with Osmani. Subsequently, he became the International Affairs Secretary of the Jatiya Janata Party.

Redwanul Hoque had close relations with key leaders of the Jatiya Janata Party. One of the party members and president, former MP Advocate Nurul Islam Khan, was a very dear friend of his. Among Sylhet leaders, he developed friendships with Advocates Devatosh Chowdhury, Khandaker Moboshir Ali, Abdul Matin Chowdhury, and others. He regularly participated in various political programmes with them. He also took part in numerous social activities with his cousin Mohammad Zahirul Haque Chowdhury, editor of the daily Sylhet Bani, and his relative, prominent community leader Kobi Abul Bashar.

When the movement for voting rights for Probashi (expatriates) began in 1994, he participated and contributed actively. The movement initially started in 1976 under the leadership of General Osmani. On March 26 1995, Redwanul Hoque filed a writ petition in the High Court Division of the Supreme Court seeking the right to vote for expatriates. Its case number is 2486/1995.

Redwanul Hoque dedicated himself to the welfare of his villagers. He particularly assisted the helpless and impoverished. If anyone in London sought his aid, he would help them with a smile. He would organise employment for those in need. Redwanul Hoque was a very religious person. His personality was extraordinary. His way of working and speaking was exemplary. He was a very big-hearted personality. He liked donating and spending a lot. Redwanul Hoque was a genuine patriot. He was dedicated to helping people for the expatriate cause. He remained connected to his village back in Bangladesh. He opened a modern restaurant called 'Sunar Bangla' in Lalbazar, Bandarbazar, Sylhet, in 1978. Although his lifestyle was quite simple, he was a hobbyist. He had limitless patience. He achieved success in life through his dedication and hard work. Just as he fought his entire life to uphold the dignity of his clan, he also worked to develop and reform society. Redwanul Haque died in London on March 22, 2010, aged 80. His dead body was sent to Bangladesh and buried beside his father mother and brother’s in his village, Sriramsi.

Note : Translated and abridged from the original Bengali. (Edited version)

গুণিজনের দৃষ্টিতে এক কর্মসাধক

এই অধ্যায়ে বিভিন্ন গুণী লেখকের দৃষ্টিতে রেদওয়ানুল হকের জীবন, কর্ম ও চরিত্রের মূল্যায়ন তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ ও সমাজে রেখে যাওয়া প্রভাব এখানে সংক্ষেপে উপস্থাপিত হয়েছে।

রেদওয়ানুল হককে যেভাবে দেখেছি

হাফিজ আব্দুস শহিদ

রেদওয়ানুল হকের মতো একজন মহৎপ্রাণ লোক আজকাল পাওয়া মুশকিল। তিনি ছিলেন একজন ধর্মপরায়ণ এবং পরোপকারী ব্যক্তি। তিনি আলিম-ওলামাকে কদর করতেন। আমি তাঁর বাড়িতে দীর্ঘ দিন লজিং থাকার সুবাদে তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। ১৯৭১-৮৪ সাল পর্যন্ত তাঁর বাড়িতে ছিলাম। আমাকে নিজের ছোটো ভাইয়ের মতো দেখতেন। তাঁদের বাংলোঘরে চালু করেন হাফিজিয়া মাদ্রাসা। এক পাশে আমি থাকতাম। অন্য পাশে মাদ্রাসা। মাদ্রাসায় আমার বেতন খুব কম ছিল। এতে আমার পোষাত না। তিনি কাউকে না জানিয়ে তাঁর পকেট থেকে আমাকে সাহায্য করতেন প্রতি মাসে। তাঁর ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া আমার হাতে। তাঁদের বাড়িতে অনেক ছাত্রের লজিং ছিল। শ্রীরামসি হাফিজিয়া ফুরকানিয়া মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করতে সহযোগিতা করেছিলেন ভাদেশ্বরের হাফিজ আবদুস সালাম।

রেদওয়ানুল হক ছিলেন দানশীল ও অমায়িক ব্যক্তিত্ব। মসজিদ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা বা কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলে তিনি নিঃসকোচে এগিয়ে আসতেন। তাঁদের বাংলোঘরে চলা হাফিজিয়ার মাদ্রাসার ছাত্রসংখ্যা বাড়তে থাকলে পাশের মসজিদে ছাত্রদের পড়ানো হতো। গ্রামে কোনো বিবাদ দেখা দিলে এই উদার ব্যক্তিত্ব এগিয়ে যেতেন। মীমাংসা করে দিতেন। পরবর্তীকালে তিনি আমাকে তাঁর খরচে লন্ডনে নিয়ে যান। ব্রিকলেন মসজিদে ১৯৮৪ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত ইমামতি করেছি।

A man of impeccable character

Muquim Ahmed

Alhaj Mohammed Redwanul Hoque was a man of an indomitable personality. A corpulent man, larger than life. He was a truly commendable individual. I describe him thus because I know him very well.

Back then, I was living at 46/48 Brick Lane, in the flat upstairs above Naz Cinema, and I often passed him on the street. This was the early 1980s. He had a fondness for me. Later, I realised why!

I would greet him warmly because he was my brother Moin's friend. The story I was told is that there wasn't a school nearby my father's village, so Moin was sent to Sreeramsree, Redwan Bhai's village, where he stayed as a boarder in my father's friend's house. This was back in the early 1940s. Sreeramree High School was well-known and attracted many students to its esteemed boys' school.

So you can imagine the fondness I had for Redwan Bhai. He was Moin Bhai's school friend. I vividly remember an incident that took place at Redwan Bhai's Sunar Bangla Restaurant at 46 Hanbury Street.

It was the early 1990s. Suddenly, Redwan Bhai called me. He said, "Muquim come at once". His voice sounded angry and urgent. I hurriedly went to his under-construction restaurant on Hanbury Street.

There he was with Sammy—a Turkish builder I did recommend. Redwan Bhai swore in Bengali, "This builder has taken my money and now won't finish the work." I could see

the situation was tense. Sammy said, “Muquim, I need more money.”

At that moment, Redwan Bhai became very angry and was about to hit Sammy with a broomstick. I stopped him just in time and sternly told Sammy that he must finish the work for which he had already received payment.

This narrative has been presented to illustrate that Redwan Bhai was a righteous and virtuous individual. He possessed no reservations but was characterised by courage and determination. He upheld his commitments and anticipated that the builder would fulfil theirs.

Redwan Bhai was a man of impeccable character. My “Murabbee” (elders) was a just and astute individual. Politically and socially, he was highly active and vibrant both here in the UK and in Bangladesh. He was a kind man, always eager to assist and emulate those in need or facing difficulties. May Allah bless his soul. Ameen.

Writer : Entrepreneur, philanthropist and community leader

কারি লিজেন্ড বেঁচে থাকুন আমাদের অন্তরে

সৈয়দ নাহাস পাশা

রেদওয়ানুল হক চাচার সাথে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় সাংবাদিকতা সূত্রে ১৯৯০ সালে। আমি তখন সাপ্তাহিক নতুন দিনে নির্বাহী সম্পাদক হিসাবে কর্মরত। প্রায়ই পূর্ব লন্ডনে কমিউনিটির অন্য মুরুব্বিদের সঙ্গে বিভিন্ন সমাবেশ বা অনুষ্ঠানে চাচার দেখা পেতাম। তখন তাঁর প্রজন্মের লোকজনই কমিউনিটিকে সরব রেখেছিলেন। বিশেষ করে বাংলাদেশের রাজনীতি, স্থানীয় বিভিন্ন ইস্যু ও বাংলাদেশের রাজনীতি ছাড়াও সিলেট অঞ্চলের নেতৃস্থানীয়দের ঘন ঘন বিলেতে আসা-যাওয়া লেগেই থাকত। তখন বর্তমানের মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক, ইমেল ইত্যাদি ছিল না, ছিল না কোনো বাংলাভাষী টেলিভিশন চ্যানেল। সাপ্তাহিক জনমত, নতুন দিন, সুরমা আর জাগরণ নামে কয়েকটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। সেটাই ছিল দেশ-বিদেশ ও কমিউনিটির সকল খবরাখবরের মাধ্যম। বাঙালি সাংবাদিকের সংখ্যাও খুব কম, যারা এই সকল পত্রপত্রিকায় কাজ করেন তারাই সকল সভাসমিতি-অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতেন। আমাদের সকল সাংবাদিকের কাছে তখন রেদওয়ানুল হক 'সোনার বাংলার চাচা' নামেই পরিচিত ছিলেন।

হ্যানবারি স্ট্রিটে কমিউনিটির প্রিয় একটি রেস্টুরেন্ট ছিল, নাম 'সোনার বাংলা'। এই রেস্টুরেন্ট চালু করেন রেদওয়ানুল হক ১৯৬৯ সালে। বর্তমানে পূর্ব লন্ডন অথবা হোয়াইটচ্যাপেল এলাকায় দেশীয় খাবারের অনেক রেস্টুরেন্ট রয়েছে। তখন বাংলাদেশি মালিকানাধীন ব্রিকলেনেও কয়েকটি রেস্টুরেন্ট ছিল। আলাউদ্দিন, সোনার বাংলা, ক্লিফটন (যাকে অনেকে মুসার ক্যাফেও বলতেন) নামের এসব রেস্টুরেন্ট বিশেষত ছিল দেশীয়দের আড্ডার স্থান। কিন্তু খাবারের জন্য ব্রিকলেন মূলধারায় এতটা পরিচিতি লাভ করেনি তখন। তবে হ্যানবারি স্ট্রিটের সোনার বাংলা রেস্টুরেন্টটি বাংলাদেশি রাজনীতিপ্রিয়দের একটি বিশেষ

আড্ডার স্থান হয়ে ওঠে। অন্যদিকে ব্রিকলেনের আলাউদ্দিন রেস্টুরেন্ট ছিল শিল্পী, সাহিত্যিক ও কবিদের চায়ের কাপে ঝড় তোলার স্থান। বর্তমানে বিলেতে বাঙালি সাংবাদিকদের প্রেসক্লাব ও নিজস্ব অফিস রয়েছে, যেখানে সবাই মিলিত হন। কিন্তু সে সময় সোনার বাংলা রেস্টুরেন্টে প্রায়ই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হতো এবং সাংবাদিকরা সেখানে আসা-যাওয়া করতেন। এসব কারণে সাংবাদিকদের সাথে রেদওয়ানুল হক চাচারও একটি মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। চাচা নিজেও দেশীয় রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

রেদওয়ানুল হক চাচা কিছুদিন বাংলাদেশে, আবার কিছুদিন লন্ডনে এভাবেই সময় কাটাতেন। তবে বাংলাদেশ থেকে ফিরে আসার সাথে সাথেই আমাদের সকল সাংবাদিকের সেটা জানা হয়ে যেত। কারণ সকল পত্রপত্রিকার সাথে তিনি যোগাযোগ রাখতেন। বিশেষ করে নবাব উদ্দিন, নজরুল ইসলাম বাসনসহ আমরা কয়েকজনের জানা হয়ে যেত চাচা বাংলাদেশ থেকে ফিরে এসেছেন। এও কথা হতো যে, নিশ্চয়ই আমাদের ডাক পড়বে শিগগির। রেদওয়ানুল হক ছিলেন বাংলাদেশের জাতীয় জনতা পার্টির একজন প্রবাসী নেতা। প্রবাসীদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া, যেমন--ভোটাধিকার, রেমিট্যান্স পাঠানোর সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি নিয়েও তিনি ছিলেন সোচ্চার। বাংলাদেশ থেকে ফিরে এলেই তিনি সাংবাদিকদের রেস্টুরেন্টে আপ্যায়নের দাওয়াত দিতেন এবং দেশে তাঁর বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করতেন। চাচা দেশে যাওয়ার আগেও সবাইকে ডেকে আপ্যায়ন করে বিদায় নিতেন। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এমএজি ওসমানীর সঙ্গে রেদওয়ানুল হক চাচার ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সত্তরের দশকে জেনারেল ওসমানী বিলেত সফরে এলে হ্যানবারি স্ট্রিটস্থ তাঁর ফ্ল্যাটেও অবস্থান করেছেন। জাতীয় জনতা পার্টির অন্যান্য নেতাও বিভিন্ন সময়ে সোনার বাংলা রেস্টুরেন্টের ওপরের তলার ফ্ল্যাটে থেকেছেন; প্রবাসে তাদের ঠিকানা হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

লন্ডনের ব্রিকলেন ও আশপাশের এলাকা অর্থাৎ, স্পিটালফিল্ড ওয়ার্ডের অফিসিয়ালি নামকরণ করা হয় 'বাংলা টাউন', সম্ভবত ১৯৯৭ সালে। এর আগে বেশ কয়েক বছর এই ওয়ার্ডকে বাংলা টাউন নামকরণের জন্য টাওয়ার হ্যামলেটসের বাঙালি বাসিন্দারা কাউন্সিলে লবিং-আন্দোলন সবই করেন। স্পিটালফিল্ড ওয়ার্ডে বাঙালিদের ঘনবসতি ছিল তখন। সিলেটের জগন্নাথপুর উপজেলার শ্রীরামসী গ্রামের বেশি

মানুষজন বাস করেন এই ওয়ার্ডে। বৃহৎ ওই গ্রামের নাম ও মানুষের অবদান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখ আছে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শান্তি কমিটি গঠনের নামে বাজারে জড়ো করে হত্যাযজ্ঞ চালায়। রেদওয়ানুল হক সেই ঐতিহ্যবাহী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩০ সালে। ১৯৫৯ সালে তিনি যুক্তরাজ্যে আসেন এবং ষাটের দশকের শেষদিক থেকে তিনি টাওয়ার হ্যামলেটসের স্পিটালফিল্ডে বসবাস শুরু করেন। তিনি এই এলাকার বাঙালিদের সকল আন্দোলন-সংগ্রাম, কমিউনিটির নানা কর্মকাণ্ড, ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রম, ব্রিকলেন মসজিদ প্রতিষ্ঠার সাথেও জড়িত ছিলেন। ষাটের ও সত্তরের দশকে বিলেতে প্রথম প্রজন্মের বাংলাদেশি যেসব নেতা কমিউনিটির কল্যাণে কাজ করেছেন, রেদওয়ানুল হক ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

রেদওয়ানুল হক সম্পর্কে স্মৃতিচারণমূলক এই বইয়ে অনেকে তাঁর জীবনের নানা দিক নিয়ে লিখেছেন। আমি সেসব বিষয় পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। তবে আমি যেহেতু রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ী ও ব্যবসা নিয়ে লেখালেখি করি, রেস্টুরেন্ট ম্যাগাজিন কারি লাইফ সম্পাদনা করি, তাই আমাদের কারি ইন্ডাস্ট্রির এই অজানা হিরো ‘কারি লিজেন্ড’ সম্পর্কে না লিখলে হবে না। আমি সেদিকেই একটু আলোকপাত করব।

প্রবাসে বাংলাদেশিদের যা কিছু অর্জন-এর মধ্যে অগ্রভাগে রয়েছে ক্যাটারিং ব্যবসা। সবচেয়ে বড়ো এম্পলয়মেন্ট সেক্টর হচ্ছে ক্যাটারিং যা মূলধারায় কারি ইন্ডাস্ট্রি বলে খ্যাত আছে। বিলেতে সর্বপ্রথম ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট খোলা হয় ১৮১০ সালে। শেখ দীন মোহাম্মদ-এর ‘হিন্দুস্তান ক্যাফে’ কিছু দিন চালু থাকার পরে বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে যুদ্ধবিধ্বস্ত ব্রিটেনকে গড়ার জন্য ভারত উপমহাদেশ থেকে অনেক ইমিগ্র্যান্ট আসেন ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে। আর নিজেদের কর্মসংস্থান তৈরির জন্য বাঙালিরা নতুন করে এই ব্যবসা শুরু করেন। রেস্টুরেন্ট ব্যবসার চালচিত্র ধীরে ধীরে বর্তমানের অবস্থানে পৌঁছেছে। জীবন-জীবিকার সন্ধানে আসা আমাদের পূর্বপুরুষেরা বিলেতে এসে কঠোর পরিশ্রম করেন। নিজেদের আর্থিক অবস্থান শক্ত করার জন্য ক্যাফে রেস্টুরেন্ট, ফ্যাক্টরি ইত্যাদিতে কাজ করে পরবর্তীকালে নিজেরা ব্যবসা শুরু করেন। ব্যবসায়িক উদ্যোক্তা হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেন। ভাবতে অবাক লাগে, এই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রথম প্রজন্মের প্রবাসীরা যুক্তরাজ্যে তাঁদের অবস্থান ও ভিত শক্ত করার জন্য ১৯৬০ সালে গঠন

করেন বাংলাদেশ ক্যাটারিং অ্যাসোসিয়েশন। এই সংগঠনটি এখনও টিকে আছে। রেদওয়ানুল হকও ছিলেন এই সংগঠনের একজন সদস্য। প্রবাসে নিজেদের কর্মসংস্থান ও জীবনমানের উন্নয়নে রেস্টুরেন্ট ব্যবসা বাংলাদেশিদের পথ সুগম করেছে। যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। রাজনীতিতেও রেখেছে বিশেষ অবদান। আরেক কারি লিজেন্ড, কমিউনিটি নেতা তাসাদ্দুক আহমদের ষাটের দশকে প্রতিষ্ঠিত সেন্ট্রাল লন্ডনের গ্যাঞ্জেস (গঙ্গা) রেস্টুরেন্ট ছিল তখনকার সময়ে বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের হাব। মওলানা ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ আরও অনেক নেতা মিলিত হয়েছেন বিভিন্ন সভায় সেই রেস্টুরেন্টে। পূর্ব লন্ডনে ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত দিলশাদ রেস্টুরেন্টের নামও এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; যেখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এসেছেন, সমর্থকদের নিয়ে মিটিং করেছেন। দিলশাদ রেস্টুরেন্টটি এখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। একই পরিবারের নতুন প্রজন্ম সেটি পরিচালনা করছে। ব্রিকলেনে রেদওয়ানুল হক প্রতিষ্ঠা করেন সোনার বাংলা রেস্টুরেন্ট ১৯৬৯ সালে। মুক্তযুদ্ধ চলাকালীন প্রবাসে জনমত সৃষ্টির জন্য অনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সোনার বাংলায়। কমিউনিটিতে রেস্টুরেন্টটির নাম পড়ে যায় 'আন্দোলনের রেস্টুরেন্ট'। সেক্ষেত্রে এই নাম এবং সোনার বাংলা দুটিই যথার্থ মনে করি। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, আব্দুস সামাদ আজাদ, দেওয়ান ফরিদ গাজী, জেনারেল ওসমানী সবাই কোনো না কোনো সময়ে এসেছেন সোনার বাংলায়। প্রবাসী বাঙালিদের সবার কাছেই পরিচিত ছিল এই রেস্টুরেন্টটি। রেদওয়ানুল হকও দেশ ও সমাজের উন্নয়নে তাঁর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ব্যবহারে কার্পণ্য করেননি। সামাজিকভাবে দেশে-বিদেশে গরিব, অসহায় মানুষ, শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তায় অগ্রভাগে ছিলেন তিনি। কোনো জনহিতকর কাজে দান করায় কখনো পিছপা হননি।

ব্রিকলেন ভেদ করে যে রাস্তাটি চলে গেছে তার নাম হ্যানবারি স্ট্রিট। আর এই রাস্তায়ই ৪৬ নম্বরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সোনার বাংলা। রেস্টুরেন্টটি এখন আর নেই। এপ্রসঙ্গে একটি কথা বলতে চাই, রেস্টুরেন্টটি না থাকলেও এর পাঁচ দশক পূর্বের অর্থাৎ, ৫০ বছরের পুরানো একটি মেন্যু এসেছে আমার হাতে। খুবই ইন্টারেস্টিং। রেদওয়ানুল হকের পরিবারের কাছ থেকে পাওয়া মেন্যুতে সে সময়ের কারি ব্যবসার অনেক হালচাল ও ধারণা পাওয়া যায় এতে। মেন্যুর একটি

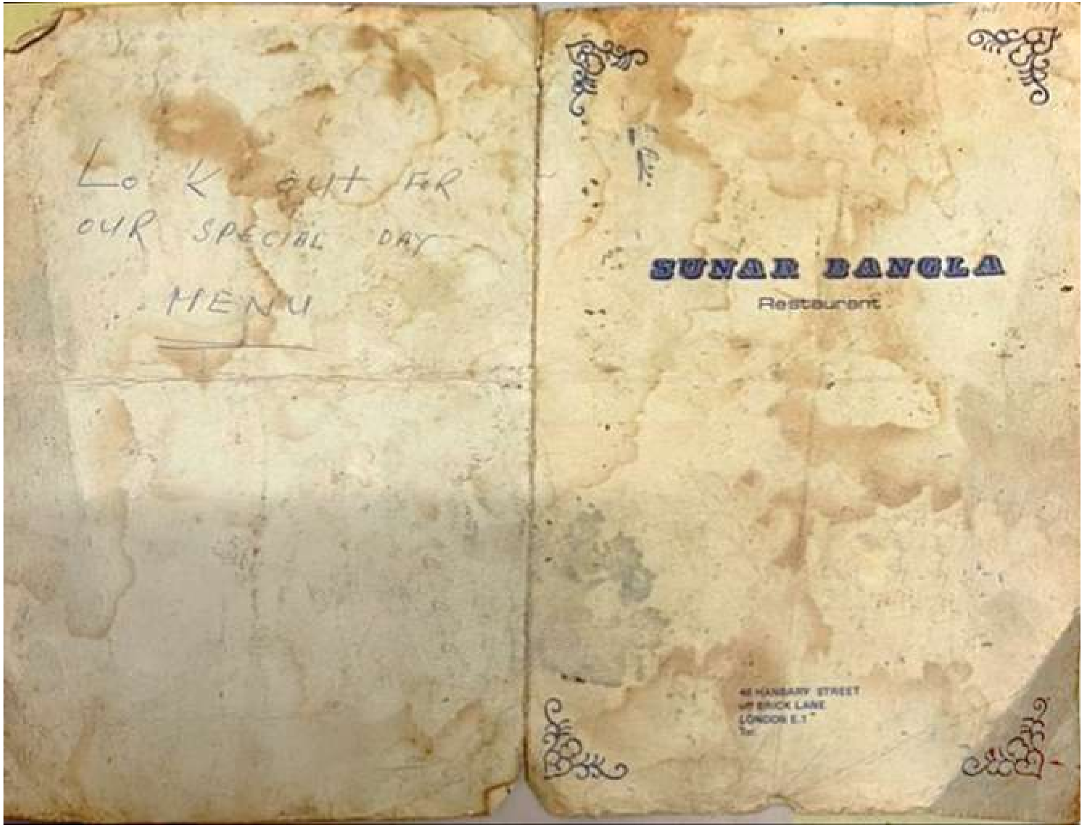
LOOK OUT FOR
OUR SPECIAL DAY
MENU
SUNAR BANGLA
Restaurant
HANBARY STREET
BRICK LANE
LONDON E.1
Tel.

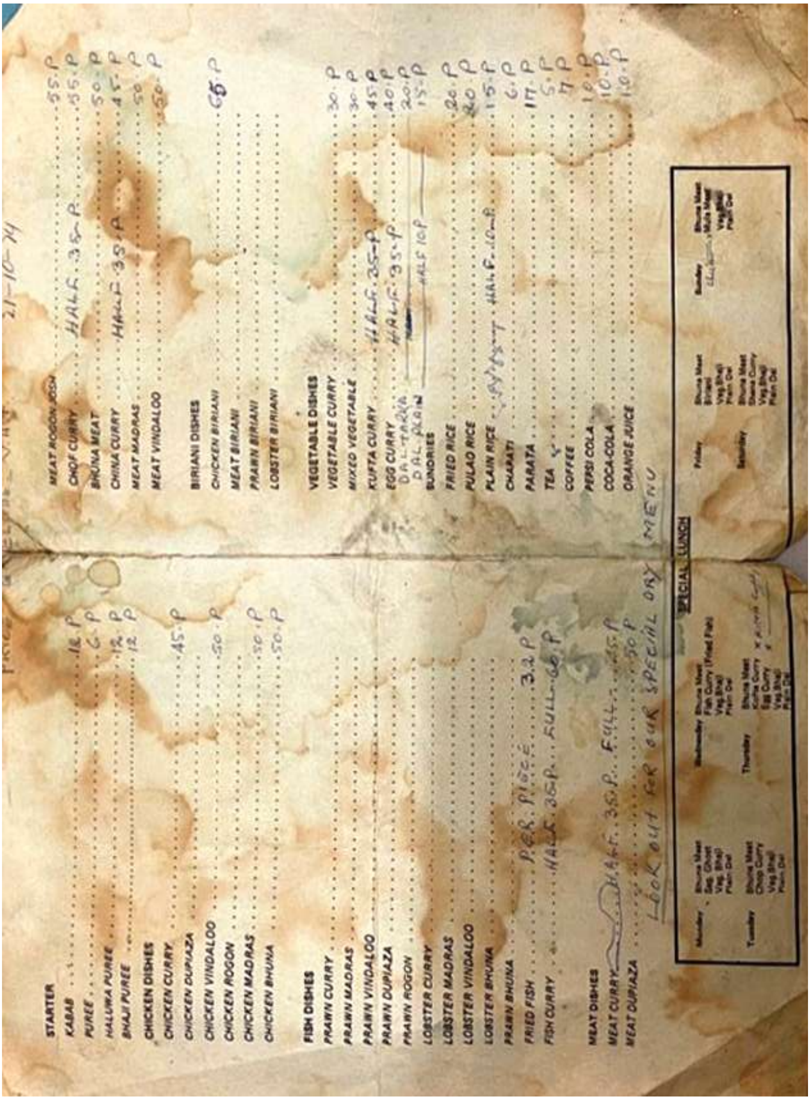

রেদওয়ানুল হক ১৯৬৯ সালে সোনার বাংলা নামে পূর্ব লন্ডনে রেস্টুরেন্ট প্রতিষ্ঠা করেন। সে সময় সারা যুক্তরাজ্যে হয়তো প্রায় হাজার খানেক ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট ছিল, যার সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ১০ হাজার। ছবিটি ১৯৭৪ সালের অর্থাৎ, প্রায় ৫১ বছর পূর্বের একটি মেন্যু। সে সময় খাবারের দাম কেমন ছিল এবং বর্তমানে কীরকম, তার একটি চিত্র তোলে ধরার জন্য মেন্যুর ছবিটি দেওয়া হলো।

ইমেজ আমি আমার লেখার সাথে সংযুক্ত করলাম। যেমন--১৯৭৪ সালে চিকেন বিরিয়ানির মূল্য ছিল ৬৫ পেনি, চিকেন ভিন্দালু, চিকেন ভুনা ইত্যাদি কারির মূল্য ছিল ৫০ পেনি। এক প্লেট ভাতের মূল্য ছিল ১৫ পেনি, চা ৫ পেনি, কোকাকোলা, ১০ পেনি ইত্যাদি। বর্তমানের মূল্যের সাথে তুলনা করলে অনেকেই আনন্দ পাবেন এতে। সোনার বাংলা রেস্টুরেন্টের এই মেন্যু যেভাবে আমার মনে আগ্রহের সৃষ্টি করেছে, সেভাবে আগামী প্রজন্মের কাছে ভবিষ্যতে আরও বেশি আগ্রহ সৃষ্টি করবে বলে মনে করি।

সোনার বাংলা রেস্টুরেন্টের স্থান ৪৬ হ্যানবারি স্ট্রিটে অন্য ব্যবসা পরিচালনা করছেন তাঁর বড়ো ছেলে এমদাদুল হক। গ্রাউন্ড ফ্লোরে সাউথ ইন্ডিয়ান খাবারের একটি রেস্টুরেন্টও রয়েছে। ব্রিকলেন ও এর আশপাশে মানে বাংলা টাউনে একযুগ আগেও প্রায় ৬০টির মতো ইন্ডিয়ান ও বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট ছিল এবং সবকটির মালিকই ছিলেন বাঙালি। এখন আর এত রেস্টুরেন্ট নেই, এর সংখ্যা এক ডজনেরও নিচে নেমে এসেছে। স্থান করে নিয়েছে চায়নিজ রেস্টুরেন্ট, ক্যাফেসহ অন্যান্য ব্যবসা। বাংলা টাউন নামও হয়তো থাকবে না এক সময়। এটাই নিয়ম, এটাই যুগে যুগে ইমিগ্র্যান্ট অধ্যুষিত এলাকার ইতিহাস। এক সময় ব্রিকলেনে ছিল ফরাসি হিউগোনোটদের বসবাস, এরপর ইহুদি ইমিগ্র্যান্ট এবং সর্বশেষ বাংলাদেশি কমিউনিটির মানুষজনের বাস যা এখন কমতে শুরু করেছে। বাঙালিরা তাদের আর্থিক অবস্থানের পরিবর্তনের সঙ্গে বসবাসের জন্য চলে যাচ্ছেন অন্যত্র।

রেদওয়ানুল হকের স্মৃতি ও কর্মকাণ্ড ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ধরে রাখতে বই প্রকাশের উদ্যোগ গহণ করেছেন তাঁর ছেলে এমদাদুল হক। অত্যন্ত ভালো উদ্যোগ। এভাবে সব সুযোগেই শুধু কারি ইন্ডাস্ট্রির নয়, এর পেছনে যাদের অবদান রয়েছে, সেসব কারি লিজেন্ডের কথা আমাদের তোলে ধরতে হবে, লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে।

ব্রিকলেনের কারি লিজেন্ড, ব্যবসায়ী, সমাজকর্মী, রাজনীতিবিদ রেদওয়ানুল হক চাচার স্মৃতি বেঁচে থাকুক সব সময় আমাদের অন্তরে।

লেখক : সম্পাদক, সাপ্তাহিক জনমত, প্রধান সম্পাদক কারি লাইফ ম্যাগাজিন, ভাইস প্রেসিডেন্ট, কমনওয়েলথ জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন। লন্ডন, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫

মো. রেদওয়ানুল হক

অনন্য এক কর্মীপুরুষ, অক্ষয় এক কীর্তিগাথা

নবাব উদ্দিন

সময় চলে যায়–দিন মাসে রূপান্তরিত হয়, মাস হয়ে যায় বছর–আর এর সাথেই মানুষের পরিক্রমা—আসা এবং যাওয়া। তবে কিছু মানুষ একদিন চলে গেলেও রেখে যান এমন অম্লান স্মৃতি, যা প্রিয়জনদের হৃদয়ে তাঁদের চিরজীবী করে রাখে। মো. রেদওয়ানুল হক, যাঁকে আমি শ্রদ্ধাভরে 'রেদওয়ান চাচা' বলে ডাকতাম, ছিলেন তেমনই একজন ব্যতিক্রমী মানুষ। তাঁর উদারতা, দূরদৃষ্টি এবং মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও অকৃত্রিম অঙ্গীকারের স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে অক্ষয় হয়ে রয়েছে।

ব্রিকলেন—বিলেতে বাঙালি কমিউনিটির হৃৎস্পন্দন

একসময়ে পূর্ব লন্ডনের ব্রিকলেন কেবল একটি রাস্তার নাম ছিল না; এটি ছিল অভিবাসী জীবনের, সংস্কৃতির এবং সংগ্রামের এক উজ্জ্বল প্রতীক। টাওয়ার হ্যামলেটস বারার অন্তর্গত এই এলাকাটি বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে ওঠেছিল বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র হিসেবে। 'বাংলা টাউন' নামে পরিচিত এই অঞ্চল ছিল যুক্তরাজ্যের 'কারি ক্যাপিটাল'–বাংলাদেশি ও ভারতীয় খাবারের অসংখ্য রেস্তোরাঁ গড়ে ওঠেছিল এখানে।

কিন্তু ব্রিকলেনের খ্যাতি শুধু খাবারের জন্য নয়। এটি বিখ্যাত ছিল তাঁর রোববারের ব্যস্ত বাজার, পুরানো ফ্যাশনের প্রদর্শনী, মিউজিক ও ভিডিও দোকান, শাড়ির দোকান, বইয়ের দোকান, বিয়ের কার্ড ছাপার প্রেস, গ্রোসারি শপ, ট্র্যাভেল এজেন্সি এবং বাংলাদেশি উদ্যোক্তাদের প্রাণবন্ত রকমারি উপস্থিতির জন্যেও। এখানকার ইট-বাঁধানো পথে ছড়িয়ে ছিল সেইসব মানুষের কথা, যারা একে একে এই অঞ্চলে এসে পা রেখেছেন, বসতি গড়েছেন–১৭ শতকের ফরাসি হুগেনট, ১৯ শতকের ইহুদি অভিবাসী এবং ২০ শতকের বাঙালি, যাদের অনেকে টেক্সটাইল

শিল্পে কাজ করতেন। এমনকি জ্যাক দ্য রিপার হত্যাকাণ্ডের এত অন্ধকার অধ্যায়ও এই এলাকার ইতিহাসের একটি অংশ।

সোনার বাংলা—একটি রেস্তোরাঁর চেয়েও অনেক বেশি কিছু

ব্রিকলেনের কেন্দ্রে, হ্যানবারি স্ট্রিটের কোণে অবস্থিত ছিল 'সোনার বাংলা' নামে পরিচিত একটি প্রতিষ্ঠান। রেদওয়ান চাচার মালিকানাধীন এই রেস্তোরাঁ কেবল খাবারের জায়গা ছিল না–এটি ছিল ঐক্যের প্রতীক, যাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশি রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা, সংস্কৃতি এবং সামাজিক অগ্রগতির আন্দোলন গড়ে ওঠেছিল। স্থানীয় ব্রিটিশরাও এর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ খাবারের জন্য এটি পছন্দ করতেন, তবে বাংলাদেশি কমিউনিটির কাছে এটি ছিল কমিউনিটির স্পন্দন এবং সংগঠনের প্রাণকেন্দ্র।

রেদওয়ান চাচা ছিলেন একজন অসাধারণ মানুষ। তাঁর চোখে ছিল বাংলাদেশ এবং প্রবাসী কমিউনিটির জন্যে এক সুদূরপ্রসারী স্বপ্ন। তিনি ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী ও কমিউনিটি নেতা। রাজনৈতিকভাবে তিনি অনুসরণ করতেন ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি এবং জাতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল মোহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানীর মতবাদ। রেদওয়ান চাচা এই দলের যুক্তরাজ্য শাখার আন্তর্জাতিক সংগঠক ও কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

আমার রেদওয়ান চাচা

১৯৯০-এর দশকে একজন প্রবাসী বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদককে সহায়তা করার সময় রেদওয়ান চাচার সাথে আমার পরিচয় হয়। তিনি নিয়মিত 'জনমত' পত্রিকার অফিসে আসতেন, যা তাঁর রেস্তোরাঁ থেকে মাত্র কয়েক মিনিটের পথ। তিনি ছিলেন পত্রিকাটির একজন আন্তরিক পাঠক। ধীরে ধীরে আমাদের সম্পর্ক গভীর হয় এবং তিনি আমাকে সন্তানতুল্য ভালোবাসা দিতে শুরু করেন। যদিও তিনি বসবাস করতেন স্ট্র্যাটফোর্ডে, কিন্তু তাঁর মন এবং সবটুকু ভালোবাসা জড়িয়ে ছিল ব্রিকলেন এবং সোনার বাংলা রেস্তোরাঁর সাথে।

তিনি প্রায়ই তাঁর রেস্তোরাঁয় রাজনৈতিক ও সামাজিক সভাসমাবেশের আয়োজন করতেন। একাধিকবার তিনি সেগুলো পরিচালনা করার জন্যে

আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন। আমি কখনোই তাঁকে না বলতে পারতাম না। এসব সভার আলোচ্যসূচিতে থাকত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যু, যেমন–বাংলাদেশে ব্রিটিশ-বাংলাদেশিদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা। অনেক সময় এসব সভায় সভাপতিত্ব করতেন ব্রিকলেনের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও দানবীর মুকিম আহমেদ। চাচার সঙ্গে কাজ করতে পারা ছিল আমার জন্য গর্বের এবং আমি চিরকাল তাঁর ভালোবাসা, আস্থা ও দিঙ্‌নির্দেশনা মনে রাখব।

স্মৃতির পাতায় উজ্জ্বল দুটি মুহূর্ত

রেদওয়ান চাচার সঙ্গে কাটানো অসংখ্য মুহূর্তের মধ্যে বিশেষভাবে দুটি স্মৃতি আমার হৃদয়ে অমলিনভাবে গেঁথে আছে।

প্রথমটি, একবার তিনি ঢাকা গিয়েছিলেন ব্রিটিশ-বাংলাদেশিদের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য হাইকোর্টের একটি রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করতে। নিজের অর্থে এই প্রচেষ্টার নেতৃত্ব দেন তিনি। তাঁর অঙ্গীকার ছিল গভীর আন্তরিক। প্রবাসীদের ভোটাধিকারের দাবিতে লন্ডনে অনেক সভা আমি তাঁর সঙ্গে করেছি, কিছু সভা পরিচালনাও করেছি। এখন জুলাই ২০২৫; আমরা এখনো সেই ভোটাধিকার পাইনি–চাচা আর নেই, কিন্তু তাঁর শুরু করা আন্দোলন আজও চলমান।

দ্বিতীয়টি, তাঁর পৈতৃক ভূমি সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর উপজেলার শ্রীরামসিতে জমি নিয়ে দীর্ঘদিনের বিরোধ। তিনি বার বার এই নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতেন, কিন্তু আশাও হারাননি। ঠিক এক মাস আগে–জুন ২০২৫–এ একটি সংবাদ প্রতিবেদনে দেখলাম তাঁর ছেলে টিপু জানাচ্ছেন, ৫০ বছর পর অবশেষে তাঁরা মামলার জায়গার দখল আদালতের মাধ্যমে লাভ করেছেন। কি অসাধারণ এক বিজয়! দুঃখের বিষয়, রেদওয়ান চাচা জীবিত থাকতে জায়গা দখল দেখে যেতে পারেননি। আমাদের বিচারব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রতা এর জন্য দায়ী। এটা অবিলম্বে দূর করার প্রয়োজন।

একটি চিরজাগরূক উত্তরাধিকার

চাচার মৃত্যুর পর সোনার বাংলা রেস্তোরাঁটি বন্ধ হয়ে গেছে। তবে তাঁর উত্তরাধিকার এখনো জীবিত-সেই একই ভবনে–যেখানে বর্তমানে তাঁর ছেলে টিপু ও তাঁর পরিবার বসবাস করছেন। তাঁরা এখনো ব্রিকলেনেই

বসবাস করেন–সম্ভবত এই স্থানটির সাথে তাঁদের এক অবিচ্ছেদ্য আবেগের কারণে। টিপু এখনো পুরানো রেস্তোরাঁর বেজমেন্ট থেকে তাঁর অফিস চালান। আমি নিয়মিত তাঁর সাথে যোগাযোগ রাখি এবং প্রতিবারই কথা বলতে গিয়ে রেদওয়ান চাচার সেই উজ্জ্বল স্মৃতিগুলো মনে পড়ে যায়।

তিনি ছিলেন এক অনন্য মানুষ–ব্যবসায়ী, কর্মী, সমাজসেবক, রাজনৈতিক চিন্তাবিদ এবং সর্বোপরি একজন ভদ্রলোক। ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি এবং বাংলাদেশের জন্য তাঁর অবদান শুধুই স্মৃতি নয়, বরং এমন এক উত্তরাধিকার, যা আজও আমাদের প্রেরণা জোগায়।

‘সোনার বাংলা-র’ চেতনা সদা জাগরূক

‘সোনার বাংলা-র’ চেতনা সদা জাগরূক ছিল আপাদমস্তক দেশপ্রেমিক বাঙালি রেদওয়ানুল হকের মনোজগতে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগেই ১৯৬৮ সালের শুরুর দিকে, তিনি তাঁর দেশপ্রেমের পতাকা তোলে ধরে পূর্ব লন্ডনে প্রতিষ্ঠা করেন সোনার বাংলা রেস্তোরাঁ। বাঙালি অধ্যুষিত ব্রিকলেনের হ্যানবারি স্ট্রিটে তিনি এটি প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু তা-ই নয়, এর এক দশকের মধ্যে ১৯৭৮ সালে তিনি ‘সোনার বাংলা’ নামেই আরেকটি রেস্তোরাঁ প্রতিষ্ঠা করেন সিলেট শহরের কেন্দ্রস্থল বন্দরবাজার এলাকায়। যদ্দূর জানা যায়, ব্রিকলেনে সোনার বাংলা রেস্তোরাঁ হচ্ছে প্রথম রেস্তোরাঁ-যার নামকরণ করা হয়েছিল বাংলায়। ১৯৬৮ সালে রেদওয়ানুল হক যখন এই রেস্তোরাঁ চালু করেন, তখন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা আজকের বাংলাদেশ একদিন স্বাধীনতা অর্জন করবে, সে কথা খুব কম মানুষের কল্পনাতেও হয়তো স্থান পেয়েছিল। ‘আমার সোনার বাংলা’ হবে এই স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত, সে কথাও হয়তো ভাবনাতেও আসেনি তখনো। কিন্তু আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতার মতোই আমাদের সেই জাতীয় সংগীতও আজ ঐতিহাসিক বাস্তবতা।

‘যার যা কিছু আছে, তা-ই নিয়ে’ লড়াইয়ের প্রস্তুতি

১৯৭১। বাংলাদেশের মানুষ তখন এগিয়ে চলেছেন স্বাধীনতার মোহনা অভিমুখে। সারা দেশ পাকিস্তানিদের নাগপাশ ছিন্ন করতে চূড়ান্ত লড়াইয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে। সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্তের ঢেউ এসে

লেগেছে এই প্রবাসেও। গোটা যুক্তরাজ্যজুড়ে সকল প্রবাসী বাঙালি 'যার যা কিছু আছে, তা-ই নিয়ে' স্বাধীনতার লড়াইয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। প্রস্তুত ৪৬ হ্যানবারি স্ট্রিটে অবস্থিত সোনার বাংলা রেস্তোরাঁও। এখানেই প্রথম স্থাপিত হয় আওয়ামী লীগের সংগ্রামকেন্দ্র। এখান থেকেই সূত্রপাত লন্ডনে স্বাধীনতা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বের প্রথম পর্যায়। সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে এই 'সোনার বাংলা' রেস্তোরাঁ থেকেই শুরু হয় বিপ্লবী কর্মযজ্ঞ। সভা আর মিছিলের কর্মসূচিতে উত্তাল হয়ে ওঠে চারদিক। বৃহত্তর লন্ডন আর সেই সাথে গোটা যুক্তরাজ্যজুড়ে দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ে স্বাধীনতার আন্দোলন। বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাঙালি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে গোটা ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও।

আন্দোলনের রেস্টুরেন্ট

স্বাধীনতা সংগ্রামের এই উত্তাল সময়ে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে বিলেত প্রবাসী বাঙালিরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে ব্যাপক কর্মসূচিতে ঐক্যবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ করেন। সোনার বাংলা রেস্তোরাঁ ছিল এর অন্যতম কেন্দ্রস্থল। প্রবাসী বাঙালিদের কাছে এই রেস্তোরাঁর নাম হয়ে যায় 'আন্দোলনের রেস্টুরেন্ট'।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এই রেস্টুরেন্টে আসেন মুক্তিযুদ্ধের অনেক অগ্রনায়ক। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ, মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল এমএজি ওসমানী, জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, আব্দুস সামাদ আজাদ, ফণী ভূষণ মজুমদার, দেওয়ান ফরিদ গাজী প্রমুখ। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীও কয়েকবার এই রেস্তোরাঁয় এসেছিলেন। পূর্ব লন্ডনে প্রবাসী বাঙালিদের সঙ্গে যোগাযোগের কেন্দ্রস্থল ছিল ঐতিহাসিক এই সোনার বাংলা রেস্তোরাঁ।

রেদওয়ানুল হক যুক্তরাজ্যে বসবাস করলেও দেশের মূলধারার রাজনীতির সাথে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এই ছাড়াও বিলেতে অনেক সমাজসেবামূলক সংগঠনের সাথেও তিনি সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

ব্রিকলেনে বসতি

১৯৬৭ সালে রেদওয়ানুল হক দেশে গিয়ে বিয়েশাদির পর বিলেতে ফিরে এসে বার্মিংহ্যামের পাট চুকিয়ে ফেলেন। স্থির করেন লন্ডনেই আবাস গড়ার। এই দফা লন্ডনে প্রবাসী বাঙালিদের প্রাণকেন্দ্র ব্রিকলেনকে ঘিরেই তাঁর পরিকল্পনা তৈরি করতে থাকেন। এই সময়েই তিনি কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের সান্নিধ্যে আসতে শুরু করেন। সম্পৃক্ত হন তদানীন্তন পাকিস্তান ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সাথে। রেদওয়ানুল হক একবার এই অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন, এছাড়াও এর কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যও ছিলেন তিনি।

প্রবাসে কিংবদন্তিদের সান্নিধ্যে

রেদওয়ানুল হক তৎকালীন যেসব কমিউনিটি নেতার সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আছেন মরহুম গৌস খান, মরহুম হাজি নেসাওয়ার আলী, মরহুম আব্দুল মতলিব চৌধুরী, দেওয়ান মনফর আলী, মতিউর রহমান, শামসুর রহমান, তৈয়বুর রহমান প্রমুখ।

মুক্তিযুদ্ধের আগুনঝরা দিনগুলো

মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণে সকল প্রবাসী বাঙালির মতো রেদওয়ানুল হকও উজ্জীবিত হন। সেই আগুনঝরা দিনগুলোতে প্রবাসী বাঙালিরা মুক্তির সংগ্রাম ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁরা সবাই মিলে লন্ডনে পাকিস্তানি হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভে অংশ নেন, হাইকমিশন থেকে পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে ফেলেন, পাকিস্তান সমর্থকদের তাঁদের সংঘর্ষ পর্যন্ত হয়। তাঁরা নিজেদের সাপ্তাহিক বেতন থেকে নিয়মিতভাবে মুক্তিযুদ্ধের তহবিলে অর্থ দান করতে থাকেন। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে অস্ত্র কেনা, রণাঙ্গনের জন্যে বিভিন্ন সামগ্রীর জোগান দেওয়া, ভারতে আশ্রয় নেওয়া কোটি শরণার্থীর জন্যে ত্রাণসামগ্রী কেনা—এরকম বিভিন্ন জরুরি প্রয়োজন মেটাতে তাঁরা সবাই চাঁদা সংগ্রহের কাজও অব্যাহত রাখেন।

মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়কের দলে সংযুক্তি

১৯৭৬ সালে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীর লন্ডন সফরকালে তাঁর নেতৃত্বাধীন জাতীয় জনতা পার্টির শাখা উদ্বোধন করা

হয়। রেদওয়ানুল হক তখন এই দলের সাথে সম্পৃক্ত হন। শুরু থেকেই তিনি জনতা পার্টির অ্যাডভাইজারি বোর্ডের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মানুষের কল্যাণে, সমাজের কল্যাণে

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের সাথে রেদওয়ানুল হক ওতপ্রোতভাবে জড়িত জীবনের সেই শুরু থেকেই, কিন্তু একই সাথে মানুষের কল্যাণে সমাজসেবার কাজেও তিনি কখনোই পিছিয়ে থাকেননি। বিলেতে তাঁর কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক সংগঠনে যেসব দায়িত্ব পালন করেছেন, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে: বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী পরিষদ সদস্য, ব্রিকলেন মসজিদ কমিটির সদস্য, সিলেট ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির সদস্য এবং বাংলাদেশ ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য। একসময় তিনি বাংলা স্কুলের গভর্নরের দায়িত্বও পালন করেছেন। ছিলেন এই সংগঠনের কার্যকরী পরিষদের সদস্যও। ল সেন্টার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনেও তিনি শামিল ছিলেন।

অনন্য এক কর্মীপুরুষ

রেদওয়ানুল হক ছিলেন অনন্য এক কর্মীপুরুষ, যিনি লক্ষ্য অর্জনে তাঁর সবটুকু শক্তি দিয়ে কাজ করে গেছেন, সেই সাথে উদ্বুদ্ধ করেছেন অন্যদেরও। শুধু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে তাঁর যে সম্পৃক্ততা ছিল তা নয়, মানুষ ও সমাজের কল্যাণেও তিনি বিভিন্নভাবে অবদান রেখে গেছেন। সৃষ্টির অমোঘ নিয়মে আজ তিনি আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু রয়ে গেছে তাঁর সেই সব কার্যক্রমের সুফল আর তাঁর অমর স্মৃতি।

তাঁর কীর্তিগাথা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে অক্ষয় হয়ে থাকুক, উদ্বুদ্ধ করুক অনাগত দিনের মানুষদের।

রেদওয়ান চাচার চিরঅম্লান স্মৃতির প্রতি নিবেদন করছি আমার গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

লেখক : হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র কর্মকর্তা, সাবেক সম্পাদক—সাপ্তাহিক জনমত; অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক প্রেসিডেন্ট, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব এবং চেয়ারম্যান—ইস্টহ্যান্ড চ্যারিটি। ২৫ জুলাই, ২০২৫ লন্ডন।

রেদওয়ানুল হক

মানবিক নেতৃত্বের উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি

মুসলেহ উদ্দিন আহমেদ

রেদওয়ানুল হক একটি নাম। যিনি শুধু একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নন; বরং মানবিকতা, সমাজসেবা ও নেতৃত্ব গুণে গঠিত এক দুর্দমনীয় চরিত্র। দীর্ঘদিন ধরে দেশ ও বিদেশে তিনি অসংখ্য সামাজিক, মানবিক এবং রাজনৈতিক কর্মযজ্ঞে নিঃস্বার্থভাবে নিজেকে যুক্ত রাখেন। তাঁর দূরদৃষ্টি, মানবিক চিন্তাধারা এবং সমাজকল্যাণে অবিচল অঙ্গীকার তাঁকে সর্বস্তরে একটি গ্রহণযোগ্য ও শ্রদ্ধেয় নাম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া মানুষের কল্যাণে তিনি ছিলেন সদাতৎপর। বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে তিনি সমাজের প্রান্তিক মানুষদের জীবনে আশার আলো পৌঁছে দিয়েছেন। দেশের সীমানা ছাড়িয়ে প্রবাসে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের সঙ্গেও তাঁর ছিল নিবিড় সম্পর্ক। তিনি প্রবাসীদের সমস্যা, চাহিদা ও সম্ভাবনাগুলো আন্তরিকতার সঙ্গে উপলব্ধি করে সমাধানের পথ খুঁজেছেন। এর ফলে প্রবাসেও তিনি এক মানবিক নেতার মর্যাদা অর্জন করেন। বিশেষ করে যুক্তরাজ্যে অবস্থানকালে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের সঙ্গে গড়ে তোলেন অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। বাংলাদেশ সফরের সময় তিনি নিয়মিতভাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতেন। কখনো মধ্যাহ্নভোজে, কখনো সান্ধ্যভোজে মিলিত হয়ে চলত মতবিনিময়, বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা। দেশে ফিরে গেলেও এই বন্ধন অটুট থাকত। পরবর্তী সফরে বিলেতে ফিরে এসে তিনি আবারও সবাইকে আমন্ত্রণ জানাতেন, সেই সম্পর্কের উষ্ণতা ধরে রাখতেন।

রেদওয়ানুল হক ছিলেন জাতীয় জনতা পার্টির আন্তর্জাতিক সম্পাদক। মহান মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক, বীর মুক্তিযোদ্ধা এমএজি ওসমানীর সঙ্গে তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক। জাতীয়

স্বার্থসংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে তাঁদের মধ্যে চলত গভীর পরামর্শ ও পারস্পরিক সহযোগিতা, যা দেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে রেখে গেছে ইতিবাচক প্রভাব। প্রবাসজীবনে তিনি যুক্তরাজ্যের ঐতিহাসিক বাংলা টাউনে 'সোনার বাংলা' নামক এক জনপ্রিয় রেস্টুরেন্ট পরিচালনা করতেন। এটি ছিল শুধু খাবারের জায়গা ছিল না, বরং একটি সাংস্কৃতিক মিলনকেন্দ্রে পরিণত হয়। চিকিৎসক, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ ও রাজনৈতিক কর্মীরা সেখানে নিয়মিত আসতেন। রেদওয়ানুল হক তাঁর অনন্য ব্যক্তিত্ব ও আন্তরিকতায় সবাইকে আপন করে নিতেন। আলোচনা চলত কমিউনিটির সমস্যা-সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ নিয়ে।

তিনি কেবল একজন সফল উদ্যোক্তা নন, একজন সাহসী সমাজকর্মী ও সাংস্কৃতিক সংগঠকও ছিলেন। বর্ণবাদের বিরুদ্ধে দৃপ্ত কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি নিজেকে যুক্তরাজ্যের প্রগতিশীল আন্দোলনের একজন উল্লেখযোগ্য মুখে পরিণত করেন। প্রবাসী বাংলাদেশি ও অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর অধিকার রক্ষায় তিনি ছিলেন সম্মিলিত কণ্ঠস্বর। নতুন প্রজন্মের মাতৃভাষা ও সংস্কৃতিচর্চা ধরে রাখতে তিনি প্রবাসে বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। তাঁর নেতৃত্বে যুক্তরাজ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। একই সঙ্গে তিনি স্থানীয় সড়ক ও স্থাপনার নামফলকে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করার আন্দোলনেও যুক্ত ছিলেন, যা ব্রিটিশ-বাংলাদেশিদের আত্মপরিচয়ের শক্ত প্রতীক হয়ে ওঠে। তাঁর অন্যতম সাফল্যপূর্ণ উদ্যোগ ছিল প্রবাসে শহিদমিনার প্রতিষ্ঠা। এর মাধ্যমে একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রবাসেও পালিত হতে শুরু করে, নতুন প্রজন্ম জানতে পারে ভাষার জন্য বাঙালির আত্মত্যাগের ইতিহাস। রেদওয়ানুল হকের জীবন ও কর্ম শুধু একজন ব্যক্তির গল্প নয়-এটি এক মানবিক নেতৃত্বের অনন্য দলিল, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য হতে পারে প্রেরণার উৎস।

লেখক : সহকারী সম্পাদক সাপ্তাহিক জনমত ৮ জুলাই, ২০২৫ লন্ডন।

রেদওয়ানুল হক : শেকড়ের স্মৃতি

নজরুল ইসলাম বাসন

১৯৮৫/৮৬ সালের দিকে লন্ডনে প্রিন্ট মিডিয়ার আমি একজন সাংবাদিক হিসেবে কমিউনিটির সাথে যুক্ত ছিলাম। এই সময় প্রথম প্রজন্মের অনেক কমিউনিটি নেতার সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল। এর মধ্যে একজন মরহুম রেদওয়ানুল হক। তিনি ব্রিকলেনে সোনার বাংলা নামে একটি রেস্টুরেন্টের মালিক ছিলেন। মরহুম রেদওয়ানুল হক ছিলেন জাতীয় জনতা পার্টির নেতা। মাঝেমধ্যে তিনি সংবাদ সম্মেলন করতেন, আমরা তাঁর রেস্টুরেন্টে যেতাম। খুব অমায়িক ছিলেন তিনি।

আমি যাঁর কথা বলছি সে সময় যাঁরা কমিউনিটির নেতা ছিলেন তাঁদের আয়ের সিংহভাগ চলে যেত সিলেটের গ্রামে তাঁদের বাড়িতে। রেদওয়ানুল হকও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। নিজ গ্রামে প্রচুর জমিজমা কিনেছিলেন।

তিনি মারা যাওয়ার পর তাঁর পুত্র এমদাদুল হক টিপু জমিজমা নিয়ে তালুকের যে মামলামোকদ্দমা ছিল তা চালিয়ে যান। তিনি মামলায় বিজয়ী হয়ে জমির দখল নেন। এখন তাঁর বাবার স্বপ্ন পূরণের জন্য গ্রামবাসীকে নিয়ে সমাজসেবা করার চেষ্টা করছেন। রেদওয়ানুল হকের পুত্র টিপু তাঁর বাবার স্বপ্ন পূরণের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। এলাকার জনগণ টিপুর সাথে কাজ করার সুযোগ গ্রহণ করবেন বলে আমি আশা করি।

আমি আগেই বলেছি, মরহুম রেদওয়ানুল হকের সাথে আমার পরিচয় ছিল। আমি তাঁকে একজন সমাজসেবক হিসাবে জানতাম। ২০০৯ সালের দিকে আমার যখন ওপেন হার্ট সার্জারি হয়েছিল, তখন তাঁর সাথে দেখা হলো। তিনিও অসুস্থ, হাসপাতালের বিছানায়। একদিন রাতে তিনি আমাকে বললেন তাঁর গ্রামে তালুক/গোরস্থান নিয়ে মামলা চলছিল, তিনি

মামলায় জিতেছেন। হাসপাতাল থেকে ভালো হয়ে বের হতে পারলে গ্রামে ফিরে গিয়ে গোরস্থানের দেওয়াল দেবেন। আমি জানি না সুস্থ হয়ে তিনি আর দেশে ফিরে যেতে পেরেছিলেন কি না? তাঁর মাতৃভূমির কোলে ফিরে যাওয়ার স্বপ্ন পূরণ হয়েছিল কি না? তাঁর পুত্ররা কি মরহুম রেদওয়ান হকের স্বপ্ন পূরণ করতে পারবেন? এই প্রশ্ন রেখে এই ছোট্ট লেখাটি শেষ করলাম।

লেখক : সাংবাদিক, প্রাক্তন সম্পাদক, সাপ্তাহিক সুরমা, লন্ডন। সাবেক মিডিয়া অফিসার - টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল।

মুক্তিযুদ্ধ ও ভোটাধিকার আন্দোলনে রেদওয়ানুল হকের ছিল অনন্য ভূমিকা

মো. রহমত আলী

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্রিটেনে যারা বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন তাদের একজন হচ্ছেন রেদওয়ানুল হক। তাঁর বাড়ি বৃহত্তর সিলেটের জগন্নাথপুর উপজেলার শ্রীরামসি গ্রামে। তবে তিনি সপরিবারে লন্ডনেই বসবাস করতেন। তাঁর বড়ো ছেলের নাম টিপু। এক ভাতিজা আতিকুল হক ছিলেন ২০২৩ থেকে ২০২৪ সালের মেয়াদে উইল্টশায়ারের স্যালিসবারি সিটি কাউন্সিলে প্রথম বাঙালি মুসলিম মেয়র। আতিকুল হক বাঙালি অধ্যুষিত ইস্টলন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটসের ব্রিকলেনে যেখানে রেদওয়ানুল হকের পরিবারের সাথে একত্রে বসবাস করে, সেখানে বেড়ে উঠলেও পরবর্তীকালে ব্যবসার প্রয়োজনে পাড়ি জমান স্যালিসবারি এলাকায়।

রেদওয়ানুল হক ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক মানুষ। মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্রিকলেন এলাকায় পাকিস্তানিদের সাথে বিভিন্ন সময় তর্কের পর একসময় তা সংঘর্ষে রূপ নিত। তখন তাঁরা দলবদ্ধ হয়ে পাকিস্তানিদের তাড়িয়ে দিতেন। এজন্য নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য রেস্টুরেন্টে বা ঘরে অনেক সময় লাঠিসোঁটা মওজুদ রাখতে হতো। এতে তাদের ব্যবসায় ব্যাপক ক্ষতিসাধন হতো। নিরাপত্তাহীনতায়ও ভুগতে হতো। তাই সে সময় বাইরে চলাফেরার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হতো। এমনকি আত্মীয়স্বজনকে নিজের ঘরে আসতে বারণ করা হতো। রেদওয়ানুল হক মুক্তিযুদ্ধের পর জেনারেল এমএজি ওসমানী প্রতিষ্ঠিত জাতীয় জনতা পার্টির আন্তর্জাতিক সংগঠক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এসময় বিভিন্ন শহরে তিনি ঝটিকা সফরে বের হতেন। দলের জন্য সদস্য সংগ্রহ করতেন। নিজের খরচে পার্টির যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করতেন।

তখন ব্রিকলেনের ৪৬ হ্যানবারি স্ট্রিটস্থ 'সোনার বাংলা রেস্টুরেন্ট' ছিল এই সবের কেন্দ্রবিন্দু। সেখানে পার্টির বিভিন্ন সভাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হতো। সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকেরা যোগ দিতেন। দেশ থেকে নেতৃবৃন্দ আসলে তাঁদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতেন। এমনকি নিজ খরচে বিভিন্ন শহরে তাদের নিয়ে দলের জন্য ক্যাম্পেইন করতেন। তাঁর ক্যাম্পেইনের সময় জাতীয় ও প্রবাসীদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া বা অধিকার আদায়ে ছিলেন সব সময় সোচ্চার। তাঁর মধ্যে ছিল, প্রবাসী মন্ত্রণালয় গঠন, ওসমানী বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিকরণ, প্রবাসীদের লাশ বিনা খরচে দেশে প্রেরণের ব্যবস্থা, প্রবাসীদের সম্পত্তি রক্ষায় আইন পাস, প্রবাসী আবাসন পল্লি গঠন প্রভৃতি। বিশেষ করে প্রবাসীদের ভোটাধিকার আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। এখানে বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের পাশাপাশি এই জন্য তিনি দেশে গিয়ে আদালতের শরণাপন্ন হন।

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের তৎকালীন বিচারপতি বিমেলেন্দু বিকাশ রায় চৌধুরী এবং বিচারপতি মুহম্মদ আব্দুল মান্নানের যৌথ বেঞ্চে ১৯৯৫ সালের ২৬ নভেম্বর প্রবাসীদের ভোটাধিকারের দাবিতে হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন করেন। এর নম্বর ছিল ২৪৮৬/১৯৯৫। বাদি ছিলেন তিনি নিজে। বিবাদি ছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী গং। আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী ছিলেন ব্যারিস্টার রওশন আলী, অ্যাডভোকেট নিতাই রায় চৌধুরী, অ্যাডভোকেট এন ইসলাম খান, ব্যারিস্টার শামসুর রহমান ও অ্যাডভোকেট খালেদা বিজলি। সরকার পক্ষে ছিলেন তৎকালীন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট হাসান আরিফ। ৩০ নভেম্বর এর প্রাথমিক শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

লেখক : সাংবাদিক ও হিউম্যান রাইটস অ্যাকটিভিস্ট। তিনি লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ও বিশ্বনাথ প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি

রেদওয়ানুল হক

প্রবাসী সমাজের অগ্রপথিক ও অনুপ্রেরণার প্রতীক

শাহাগীর বখত ফারুক

সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার শ্রীরামসি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন যুক্তরাজ্য প্রবাসী বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা রেদওয়ানুল হক। তাঁর জন্ম গ্রামবাংলার নিভৃত কোণে হলেও জীবন গড়ে ওঠেছিল আন্তর্জাতিক মঞ্চে। বিশেষ করে যুক্তরাজ্যের পূর্ব লন্ডনে, যেখানে তিনি একসময়ে বাংলাদেশি কমিউনিটির অগ্রদূত হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

৭০-এর দশকে ব্রিটেনে বাংলাদেশি ব্যবসার পদচারণা তখনো শুরুর পথে। ঠিক সেই সময়ই তিনি পূর্ব লন্ডনের হ্যানবারি স্ট্রিটে 'সোনার বাংলা রেস্টুরেন্ট' প্রতিষ্ঠা করেন। যা ছিল ওই এলাকায় প্রথম বাংলাদেশি মালিকানাধীন রেস্টুরেন্ট। এটি শুধুই একটি খাদ্য পরিবেশনকেন্দ্র ছিল না; বরং হয়ে ওঠে বাঙালি প্রবাসীদের মিলনস্থল, সংস্কৃতি ও রাজনীতির এক প্রাণকেন্দ্র।

রেদওয়ানুল হক রাজনীতিতেও ছিলেন সুদক্ষ ও প্রভাবশালী। তিনি ব্রিটিশ কনজারভেটিভ পার্টির একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে বাংলাদেশি কমিউনিটির স্বার্থরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁর আমন্ত্রণে তৎকালীন ব্রিটিশ হোম সেক্রেটারি তাঁর রেস্টুরেন্টে অংশ নেন এক ভোজসভায়। সে সময় প্রবাসীদের জন্য ছিল একটি ঐতিহাসিক অর্জন এবং কমিউনিটি রাজনৈতিকভাবে দৃশ্যমান হওয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। তিনি শুধু ব্যবসায়ী বা রাজনীতিক ছিলেন না; ছিলেন এক মানবিক, পরোপকারী ও নির্ভীক মানুষ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান ছিল সুদৃঢ় এবং স্পষ্ট। তিনি কমিউনিটির বহু সমস্যার সালিশ হিসেবে কাজ করেছেন, কিন্তু কখনো সত্য ও ন্যায়ের বাইরে আপস করেননি। রেদওয়ানুল হকের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল, তাঁর ধর্মীয় ও

সামাজিক অবদান। ব্রিকলেন মসজিদের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে তিনি নানা দিক দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। মৃত্যুর আগপর্যন্ত তিনি ছিলেন মসজিদের একজন নিয়মিত মুসল্লি। তাঁর জীবনের একটি বিস্ময়কর অধ্যায় হলো—একটি জমিসংক্রান্ত মামলা, যা তিনি ১৯৭৫ সালে দায়ের করেছিলেন। দীর্ঘ প্রায় ৫০ বছর পর এই মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়েছে। এই মামলার রায় আসে তাঁর পক্ষে। ২০১০ সালে রেদওয়ানুল হক আমাদের ছেড়ে চলে যান। কিন্তু তাঁর জীবন, আদর্শ, নেতৃত্বগুণ, সমাজসেবা এবং প্রবাসী কমিউনিটির প্রতি ভালোবাসা আজও আমাদের মাঝে অনুপ্রেরণার বাতিঘর হয়ে জ্বলছে।

স্মরণীয় অবদানসমূহ

পূর্ব লন্ডনের প্রথম বাংলাদেশি মালিকানাধীন রেস্টুরেন্ট 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠা, কনজারভেটিভ পার্টির সক্রিয় সদস্য হিসেবে প্রবাসীদের জন্য রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার, ব্রিকলেন মসজিদের প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা, কমিউনিটি সালিশ, সমাজসেবা ও ন্যায়ের পক্ষে আপসহীন ভূমিকা এবং দীর্ঘমেয়াদি মামলা জয়ের মাধ্যমে ন্যায়ের দৃষ্টান্ত স্থাপন।

পরিশিষ্ট

রেদওয়ানুল হক ছিলেন এক স্বপ্নদ্রষ্টা। যিনি শুধু নিজের জীবনের সাফল্য নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেননি। তিনি চেষ্টা করেছেন, যাতে তাঁর কমিউনিটি, তাঁর প্রজন্ম ও তাঁর ভবিষ্যৎ উত্তরসূরিরা আরও এগিয়ে যেতে পারে। আজকের সফল প্রবাসী বাংলাদেশি সমাজের ভিত গড়ে তুলতে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়।

লেখক : প্রবীণ ব্যবসায়ী, সাবেক প্রেসিডেন্ট, ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স।

রেদওয়ানুল হক মামা ও ‘আকুব খাঁ’ তালুকের মামলার ইতিবৃত্ত

মো. হাফিজুর রহমান চৌধুরী

জগন্নাথপুর থানার শ্রীরামসি গ্রামের দিঘিরপার পাড়ার মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারের রেদওয়ানুল হক গংদের পরিবার সমূহের নিজস্ব স্বাধীন মৌরশি তালুক ‘আকুব খাঁ’—যার মূল মালিক ওই রেদওয়ানুল হকের বংশীয় পরিবারবর্গ। ওই তালুক সম্পর্কে লেখায় আলোকপাত করব।

দিঘিরপার পাড়ার খান পরিবারও ‘আকুব খাঁ’ তালুকের মালিক বলে দাবি করলে রেদওয়ানুল হকের পরিবারদের সাথে ‘ময়ুর খাঁ’ পরিবারের ‘আকুব খাঁ’ তালুকের মালিকানা নিয়ে প্রায়সময় ঝগড়াঝাটি ও যৌথ অনেক সম্পত্তি নিয়ে মনোমালিন্য হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামসি হাইস্কুলে বিচার উপলক্ষ্যে বেশ কয়েক বার পঞ্চায়েত ডাকা হয়। ওই বিচারসমূহে আশপাশের ও বেশ দূরদূরান্তের গ্রাম্য বিচারকরা আসেন। আমিও বিচারে কয়েক দিন উপস্থিত ছিলাম। উভয়পক্ষ রেকর্ডাদি, কাগজপত্র ও মালিকানা দলিলসমূহ এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র বিচারকদের নিকট জমা দেয়। বিচারকদের মধ্যে বিশ্বনাথ থানার কাসিমপুরের বিচারক আলতাফুর রহমান, জগন্নাথপুরের সাহারপাড়া গ্রামের ছমদু মিয়া, পীরেরগাঁওয়ের তোরাব আলম, বালাগঞ্জের মোল্লাপাড়ার এক বিচারক মাওলানা এবং আশপাশ গ্রামের ও নিজ গ্রামের বিশিষ্ট বিচারকবৃন্দসহ অনেক লোক বিচারসমূহে সমবেত হন।

দলিলাদি ও কাগজপত্র পর্যালোচনা করে বিচারকগণ উভয়পক্ষকে তাদের একটি কবরগাহ (কবরস্থান) ও একটি বড়ো দিঘিসহ কিছু যৌথ সম্পত্তি আপসে বণ্টন করে দেনদরবার শেষ করে দেওয়ার উদ্যোগ নেন এবং অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁরা উভয়পক্ষকে কোনো প্রকারেই সম্মত

করে দেনদরবার শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করেও সফল হতে পারেননি। প্রত্যেক পক্ষই সম্পত্তিসমূহের ও তালুকের একক মালিক বলে ঘোষণা করে। বিচারকগণ ও আমিসহ উভয়পক্ষকে বলে দিই, আপনারা কেউ একক মালিক হতে পারবেন না, অযথা মামলামোকদ্দমা করে উভয়পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

কিছুদিন পরে রেদওয়ানুল হক (যিনি আমার সম্পর্কে মামা হন) আমার নিকট সিলেটে আমার বাসায় কাগজপত্র নিয়ে আসেন এবং মামলা করার ব্যাপারে পরামর্শ করেন। কাগজপত্র দৃষ্টে প্রাথমিকভাবে আমার কাছে প্রতীয়মান হয়, ওই 'আকুব খাঁ' তালুকের মূল মালিক রেদওয়ানুল হকের বংশধরেরা এবং 'ময়ুব খাঁ' পরিবার আংশিক ও খরিদ সূত্রে কিছু অংশের মালিক হন। আমি মামা রেদওয়ানুল হককে বলি, মামা! আপনারা মামলা করলে আপনাকে অনেকদিন লড়াই করে যেতে হবে। তালুকের মালিকানা পেতে পারেন, কিন্তু অনেক কষ্ট হবে, অনেক দিন লাগবে, অনেক টাকাপয়সা খরচ হবে এবং আপনি একক মালিক না হয়ে আপনার সমস্ত গোত্র বা বংশধর মালিকানা অর্জন করবে।

রেদওয়ানুল হক বলেন, বংশমর্যাদা রক্ষার জন্য আমি টাকাপয়সা খরচ করব, কষ্ট করব। মর্যাদা যদি রক্ষিত না থাকে তবে টাকাপয়সার কী দরকার? যত টাকা খরচ হয় আমি বংশের জন্য খরচ করব। এভাবে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেন। রেদওয়ানুল হক ওই বংশের একজন অতি সাহসী ও মর্যাদাবান বীরপুরুষ ছিলেন।

আমি তখন নতুন অ্যাডভোকেট হয়েছি। আমার টেবিলের এক সিনিয়র সহকর্মী যার নাম অ্যাডভোকেট মকবুল হোসেন। মামাকে নিয়ে তাঁর কাছে যাই এবং সমস্ত কাগজপত্র দেখিয়ে আমি এবং তিনি কাগজ পর্যালোচনা করে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিই। অ্যাডভোকেট মকবুল হোসেনকে কাগজপত্র সমঝে দিয়ে আসি। তিনি অ্যাডভোকেট রাধাকান্ত বাবুর পরামর্শ নিয়ে মামলার আরজি প্রস্তুত করেন এবং মামলা সিলেট কোর্টে দায়ের করা হয়। পরবর্তীকালে ওই মামলা অ্যাডভোকেট আবু হাসান আব্দুল্লাহের নিকট পরিচালনা করার জন্য দেওয়া হয়। অ্যাডভোকেট আবু হাসান আব্দুল্লাহ্ আরজিতে অনেক সংশোধন করেন। মামলা সিলেট কোর্টে চলতে থাকে। বেশ কিছু দিন পরে বৃহত্তর সিলেট জেলা যখন চারটি জেলায় বিভক্ত হয়, তখন জগন্নাথপুর থানাধীন সকল

সম্পত্তির মামলা সুনামগঞ্জ জেলা কোর্টে চলে যায়। রেদওয়ানুল হকের পক্ষে আমি এবং আবু হাসান আব্দুল্লাহ অ্যাডভোকেট হিসাবে সুনামগঞ্জ কোর্টে মামলা পরিচালনা করতে থাকি। বিবাদি খাঁ বাড়ির পক্ষে সিলেটের প্রবীণ আইনজীবী জিতেন্দ্র নারায়ণ দেব ওরফে জিতেন বাবু ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র অ্যাডভোকেট ধ্রুবজ্যোতি শ্যাম মামলা পরিচালনা করতে থাকেন। রেদওয়ানুল হক তাঁর পক্ষে সুনামগঞ্জ বারের আরও দুজন বিখ্যাত আইনজীবী নিয়োজিত করেন। প্রয়োজনবোধে ওই দুজন আইনজীবী মামলা পরিচালনায় আমাদের সহযোগিতা করবেন। মামলার সাক্ষীপ্রমাণ শেষে বেশ কয়েকদিন Argument (যুক্তিতর্ক) চলে। Argument-এর সর্বশেষ তারিখে অ্যাডভোকেট জিতেন্দ্র নারায়ণ দেব ওরফে জিতেন বাবু একটি দরখাস্তসহ মামলায় লিখিত Argument দাখিল করেন। আদালত তা গ্রহণ করেন। আদালত আমাদেরকেও লিখিত Argument দেওয়ার আদেশ দেন।

এরপর আমরা সিলেট চলে আসার পথে আবু হাসান আব্দুল্লাহ অ্যাডভোকেটের সঙ্গে লিখিত Argument সম্পর্কে আলোচনা করলে তিনি লিখিত Argument-দিতে নারাজি প্রকাশ করেন। তাঁর সাথে আমার ও রেদওয়ান মামার আরও অনেক আলাপ-আলোচনা ও তর্কবিতর্ক হয়। আমরা সিলেট চলে আসি। ওই দিন রাতে মামা রেদওয়ানুল হক আবু হাসান আব্দুল্লাহ অ্যাডভোকেটের বাসায় যান এবং লিখিত Argument দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু আবু হাসান আব্দুল্লাহ অ্যাডভোকেট কিছুতেই লিখিত Argument দিতে রাজি হননি; তখন মামা আমার বাসায় চলে আসেন। মামলা চলাকালীন মামা আমার বাসায় থাকতেন। আমি জিজ্ঞাসা করলে মামা বলেন, ‘আমার মামলায় আবু হাসান আব্দুল্লাহ লিখিত Argument দেবেন না, ভাগিনা, আমার জীবনের সমস্ত কষ্ট, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ ও সুদীর্ঘ ২৫/৩০ বৎসর মামলা করে কোনো ফল হবে না, যদি তিনি লিখিত Argument না দেন।’ আমি তখন মামাকে সান্ত্বনা দিই যে, আপনি ধৈর্য ধরুন, আমিতো আপনার এক ভাগিনা উকিল আছি, আমি তাঁকে (আবু হাসান আব্দুল্লাহ্) অনুরোধ করে বাধ্য করব লিখিত Argument দেওয়ার জন্য। যদি আমি অপরাগ হই, তাহলে আমি অন্য সিনিয়র অ্যাডভোকেট নিয়ে প্রয়োজনে একজনের জায়গায় তিনজন অ্যাডভোকেট নিয়ে লিখিত Argument প্রস্তুত করে দাখিল করব।’ তাঁকে আরও অনেক সান্ত্বনা দিই।

পরের দিন আমি কোর্টে গেলে অ্যাডভোকেট আবু হাসান আব্দুল্লাহ্ও কোর্টে আসেন। আমরা উভয়ের মধ্যে অনেক কথাবার্তা হয়। হাসান আব্দুল্লাহ্ কিছুতেই লিখিত Argument দিতে রাজি হননি। আমি তাঁকে বলি যে, 'সিনিয়র, আপনি এই মামলার শুধু উকিল, কিন্তু আমি রেদওয়ানুল হকের উকিল এবং ভাগিনা হই। যদি লিখিত Argument না দেওয়ার কারণে আমরা মামলায় পরাজিত হই, তাহলে এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী আপনি হবেন। আমি বুঝতে পারছি না কী জন্য আপনি লিখিত Argument দিতে এত নারাজ।' এরপর তিনি জোহরের নামাজে চলে যান। কিন্তু নামাজ না পড়েই রাস্তা থেকে আমার কাছে ফিরে আসেন। এসে আমার কাছে বসে বলেন, 'হাফিজুর রহমান, আপনি বলেছেন যদি আমরা লিখিত Argument না দিই, তবে আমাদের Argument বাতাসে থাকবে আর অ্যাডভোকেট জিতেন্দ্র নারায়ণ দেব ওরফে জিতেন বাবুর Argument মামলার নথিতে থাকবে। তখন জজ তাঁদের পুরো বক্তব্য লিখিত পাবেন, আর আমাদের বক্তব্য বাতাসে থাকবে। তখন মামলায় আমাদের হেরে যাওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকবে—কথাগুলো সম্পূর্ণ সঠিক। কিন্তু আমি কী জন্য লিখিত Argument দিতে রাজি হচ্ছি না, তা আপনাকে বলি। অ্যাডভোকেট জিতেন বাবু তাঁর লেখা Argument-এ ১৬টি কেস রেফারেন্স দিয়েছেন, এসব রেফারেন্সের বই আমরা কোথায় পাব?' আমি তখন আবু হাসান আব্দুল্লাহকে বলি, 'আপনি তো সে কথা আমাদেরকে বলবেন। কিন্তু তা না করে আপনি নারাজি প্রকাশ করলেন। আমি যেভাবে হোক সমস্ত রেফারেন্সের বই জোগাড় করে আপনাকে দেব, যত টাকা খরচ হোক, তা আমরা করব।'

আমার এই সমস্ত কথা শুনে আবু হাসান আব্দুল্লাহ সাথে সাথে বারের লাইব্রেরিয়ানকে ডাকেন এবং সমস্ত রেফারেন্স বই সংগ্রহ করে দিতে বলেন। আমি লাইব্রেরিয়ানকে সাথে সাথে ১ হাজার টাকা প্রদান করি এবং বলি, যত টাকা লাগে আপনাকে আমরা দেব। তবে যেভাবে হোক রেফারেন্স বইগুলো আমাদেরকে সংগ্রহ করে দিতে হবে।

যেমন কথা তেমন কাজ। লাইব্রেরিয়ান সপ্তাহের মধ্যেই সকল রেফারেন্স বই আমাদেরকে সংগ্রহ করে দেন। কিছু বই অবশ্য আমাদের কাছেও ছিল। আমি লাইব্রেরিয়ানকে যথাসম্ভব সম্মানী দিই। এগুলো শুনে

ও দেখে রেদওয়ানুল হক মামা এত খুশি হন যে, তাঁর হাতে কেউ কোটি টাকা দিলেও এত খুশি হতেন না। অ্যাডভোকেট আবু হাসান আব্দুল্লাহ্ রেফারেন্স বইসমূহ পাঠ করে আশ্চর্য হয়ে যান। দেখা যায় যে, প্রায় সবকটি মামলাই আমাদের পক্ষে এবং অ্যাডভোকেট জিতেন বাবুর বিপক্ষে। আবু হাসান আব্দুল্লাহ কোর্টে এসে আমাকে মায়ার সাথে অতি আনন্দিত হয়ে জড়িয়ে ধরেন এবং বলেন, হাফিজ সাহেব, আমরা শতভাগ কৃতকার্য হব। কারণ সব রেফারেন্স আমাদের পক্ষে। এরপর আমরা সকল বই দুইটি বড়ো চাউলের বস্তায় ভরে সুনামগঞ্জে যেদিন মামলার তারিখ, সেই দিন লিখিত Argument সহ আদালতে উপস্থিত হই। অ্যাডভোকেট আবু হাসান আব্দুল্লাহ্ আদালতকে বিস্তারিতভাবে রেফারেন্স সম্পর্কে অনেক কিছু বলেন ও দরখাস্তসহ লিখিত Argument দাখিল করেন। আদালত তা গ্রহণপূর্বক সিনিয়র অ্যাডভোকেট জিতেন্দ্র নারায়ণ দেব ওরফে জিতেন বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, সিনিয়র, আপনি কিছু বলুন। জিতেন বাবু জবাব দেন, আমার যা বলার তা বলেছি, লিখিত Argument দাখিল করেছি। আমি তখন দাঁড়িয়ে আদালতের অনুমতি নিয়ে সিনিয়র জিতেন্দ্র নারায়ণ দেবের দাখিলকৃত রেফারেন্সের ওপর আমার বক্তব্য রাখি এবং আদালতে নিবেদন করি, বিবাদি পক্ষ মামলার বিষয়ে নানান প্রোপাগান্ডা করছে এবং আমার মক্কেলকে হয়রানি ও ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

আল্লাহর মর্জিতে আমরা মামলায় জয়ী হই। সুনামগঞ্জ আদালতে রেদওয়ানুল হক গং পক্ষে 'আকুব খাঁ' তালুকের তেরো ভাগের নয় অংশের মালিক বলে ঘোষণা করা হয়। খান বাড়ির 'ময়ুর খাঁ'-গং পক্ষে তাঁর বংশধর তেরো ভাগের দুই ভাগ অংশে মালিকানা হিসাবে ও তেরো ভাগের দুই ভাগ অংশে খরিদ সূত্রে ওই 'আকুব খাঁ' তালুকের মালিক হন। এ মামলা ঢাকা হাইকোর্টে আপিল করলে 'ময়ুর খাঁ'-এর বংশধর সেখানেও মামলায় হেরে যায়। অতঃপর সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগেও হেরে যান। সর্বশেষে চূড়ান্ত বিজয়ের পরে অর্থাৎ, দীর্ঘ ৫০ বছর পর চূড়ান্ত ডিক্রির মর্মানুসারে স্বত্ব জারি মোকদ্দমার মাধ্যমে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী আইনি কর্তৃপক্ষ শ্রীরামসি গ্রামের দিঘিরপার গ্রামে গিয়ে রেদওয়ানুল হক ও তাঁর বংশধরের তালুকের মালিকানা সরেজমিনে দখল অর্পণ করে আদালত এই মোকদ্দমা চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি করেন।

রেদওয়ানুল হক যেভাবে প্রথমে বংশের মর্যাদা রক্ষার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করে ছিলেন, সুদীর্ঘ ত্রিশ বছরেরও অধিককাল মামলা চালিয়ে এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্থলবর্তী উত্তরাধিকারীগণ ও মামলা চালিয়ে জয়ী হয়ে তাঁর বংশের মর্যাদা রক্ষা করেছেন। তিনি ওই বংশের একজন অতি প্রতিভাবান বীরপুরুষ ছিলেন। বর্তমানে তিনি দুনিয়াতে নেই, মহান আল্লাহ তাঁকে বেহেশত নসিব করুন—এই কামনা করি।

লেখক : অ্যাডভোকেট, জজকোর্ট, সিলেট।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার অনেক পূর্বে পূর্ব লন্ডনের ব্রিকলেন

আবদুল মুকিত

পূর্ব লন্ডনের ৪৬ হ্যানবারি স্ট্রিটে অবস্থিত ‘সোনার বাংলা’ রেস্টুরেন্ট-এর প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী মো. রেদওয়ানুল হক এবং পরবর্তীকালে ১৯৭৮ সনে একই নামকরণে (সোনার বাংলা) তিনি বাংলাদেশের সিলেট বিভাগীয় শহরের বন্দরবাজার এলাকায় আরও একটি রেস্টুরেন্ট প্রতিষ্ঠা করেন।

ব্রিকলেনের প্রথম বাঙালি রেস্টুরেন্ট হিসাবে ‘সোনার বাংলা’ রেস্টুরেন্ট বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মজাদার খাদ্যের সমারোহ ছিল এই রেস্টুরেন্টে এবং বিশেষ করে প্রবাসী বাংলাদেশিদের যোগাযোগের স্থান ছিল এই রেস্টুরেন্ট।

দেশে-বিদেশে বিভিন্ন সেবামূলক সংগঠন ও কমিউনিটির একজন সমাজসেবক ছিলেন মো. রেদওয়ানুল হক। দেশে একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব হিসাবে তাঁকে গণ্য করা হতো। তিনি ছিলেন এক কর্মঠ রাজনৈতিক কর্মী। দেশের মানুষের প্রতি তাঁর অসীম ভালোবাসা ও স্বদেশপ্রেম ছিল। দেশে ও প্রবাসে তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। তিনি ছিলেন উদার মনের মানুষ এবং সবসময় মানুষের মঙ্গল কামনা করতেন।

মো. রেদওয়ানুল হক ১৯৩০ সালের ৩ মার্চ সিলেট বিভাগের সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর থানার শ্রীরামসি দিঘিরপারস্থ এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম আলেম পরিবার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ সকলেই প্রখ্যাত আলেম ও বিখ্যাত সমাজসেবক ছিলেন। পিতা মরহুম মো. মাহফুজুল হক একজন শিক্ষিত সমাজসেবক ছিলেন। গ্রাম্য সালিশে তাঁর বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যেত। আরবি, ফারসি ও ইংরেজি ভাষায় তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। তাঁর মাতা মরহুমা আমিরুন্নেছা

সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে আগত এবং একজন ধার্মিক মহিয়সী গৃহবধূ ছিলেন। চার ভাই ও পাঁচ বোনের মধ্যে মো. রেদওয়ানুল হক ছিলেন ষষ্ঠ। বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে অবদান ছিল অনস্বীকার্য। বাড়ির সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত মসজিদে, কবরস্থান ইত্যাদিতে তাঁর অবদান অতুলনীয়।

মো. রেদওয়ানুল হক খেলাধুলায় (যেমন—হাডুডু, হকি ও ফুটবল) অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তিনি নিজ এলাকা ছাড়াও বিখ্যাত শহর চট্টগ্রাম ও রাঙামাটি প্রভৃতি শহরে ফুটবল খেলে অনেক সুনাম অর্জন করেন, শিল্ড, মেডেলসহ অনেক প্রশংসাপত্র কুড়িয়েছিলেন। তাছাড়া এলাকার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, ক্রীড়ানুষ্ঠান, গ্রামের সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে ও বিচার-পঞ্চায়েতে নিজে জড়িত থাকতেন। তিনি যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

তিনি ব্যবসায়িক কাজে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেছেন। শিলং, কলকাতা, আসামের খিদিরপুর, ঢাকার তেজগাঁওসহ বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে ও ব্যবসা করে ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

মো. রেদওয়ানুল হকের স্ত্রী. দুই পুত্র ও দুই কন্যা। দানবীর মো. রেদওয়ানুল হক অতিশয় দয়াবান ছিলেন। তিনি দান-খয়রাত করতে ভালোবাসতেন। তিনি আমাকে আপন ছোটো ভাইয়ের মতো স্নেহ করতেন। সামাজিক, পারিবারিক, আর্থিক বিভিন্ন কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা ও পরামর্শ দিয়ে আমাদের সাহায্য করতেন। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাঁকে প্রতিদান হিসাবে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন। তাঁর উত্তরাধিকারীগণের দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করি!

রেদওয়ানুল হক ছিলেন নিরলস সমাজসেবক

হারুণ মিয়া

আমার পূর্বপুরুষ ও আমাদের বংশের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে লেখাটি শুরু করলাম। ঐতিহ্যবাহী শ্রীরামসি গ্রামের, আমাদের দিঘিরপারের অতি শ্রদ্ধেয় আমার চাচাতো বড়ো ভাই মরহুম রেদওয়ানুল হকের অতীত জীবন সম্পর্কে আমার জানামতো ও যত কিছু সত্য দেখেছি তা-ই লিখছি। আমার দেখা মতে তিনি ইংল্যান্ডে বার্মিংহ্যাম শহরে, ওয়ালসল এলাকায় টাস্কার স্ট্রিটে নিজস্ব বাড়িতে তাঁর ছোটো ভাইকে নিয়ে বসবাস করেতন। তা ছিল ১৯৬০-এর দশকে। তিন একজন সমাজসেবক ছিলন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে কেউ ইংল্যান্ডে এসে অসহায় অবস্থায় পড়লে তাকে সযত্নে নিজস্ব বাড়িতে নিজ খরচে রেখে কাজে লাগিয়ে দিতেন। আমি দেখেছি, অপরের প্রতি তাঁর ভালোবাসা। ৭০-এর দশকে তিনি লন্ডন শহরে বসতি শুরু করেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তিনি হ্যানবারি স্ট্রিট-ইস্ট লন্ডনে প্রথম সোনার বাংলা নাম দিয়ে একটি রেস্টুরেন্ট চালু করেন। সমাজসেবার সাথে সাথে লন্ডনে ব্রিকলেন মসজিদ প্রতিষ্ঠায় শ্রম ও অর্থ ব্যয় করেছেন।

আশির দশকে তিনি এমএজি ওসমানীর সাথে ইউকে-তে জনতা পার্টির সাথে যুক্ত হন। আমি নিজেও তাঁদের সাথে ইউকে-র বিভিন্ন স্থানে ঘুরেছি।

বড়ো ভাই রেদওয়ানুল হক তখন থেকেই বৃহত্তরভাবে রাজনীতির মাঠে চলে আসেন। সেসময় তিনি পার্টির খরচ চালাতেন নিজের পকেটের পয়সা দিয়ে। আমি দেখেছি, তিনি বাহ্যিকভাবে একজন গরম মেজাজের মানুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রাণটা ছিল অতি কোমল। গরিব-অসহায় মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অসীম দরদ।

২০০০ সালে মিলেনিয়ামের দশকে আমাদের দিঘিরপারের উন্নতির জন্য ইউকে-তে দিঘিরপার ডেভলপমেন্ট অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন করেছিলাম। এতে তিনি অনেক উৎসাহ দিয়েছিলেন। পরিবার তথা বংশের মান-মর্যাদা রক্ষায় তিনি ছিলেন অগ্রগামী। বংশের অস্তিত্বের প্রশ্নে কোনো আপস করতেন না। তাঁর কাজের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার কাছে তাঁর জন্য মাগিফরাত প্রার্থনা করি। আল্লাহ যেন তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেন। আ-মিন।

রেদওয়ানুল হক সম্পর্কে দুটি কথা

সদরুল মাজীদ

কদিনের এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় যারা ভালো কাজের মধ্যে জীবন পরিচালিত করেন কিংবা মানবকল্যাণে শ্রম মেধা-বিত্তবৈভব ব্যয় করেন তারাই উত্তম মানুষ। আমার আজকের আলোচনা যে মানুষটিকে নিয়ে তিনি অনেকদিন হয় আমাদের ছেড়ে মহান আল্লাহ পাকের সান্নিধ্যে চলে গেছেন, তিনি আমাদের প্রিয় রেদওয়ানুল হক। তিনি ছিলেন একান্ত আপনজন, সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব ও আমাদের প্রতিবেশী এবং নিকটাত্মীয়। জন্মের পর থেকে আমি তাঁকে একজন সহজ-সরল নিবেদিতপ্রাণ সমাজকর্মী হিসেবে দেখে আসছি। কথাবার্তায় শালীন, নম্র-মার্জিত আচরণ এবং মানবতার সেবায় অগ্রসৈনিক-সংগঠক হিসেবে বিজ্ঞ ছিলেন। এককথায় আমাদের সামাজিক জীবনে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে তাঁর উপস্থিতি ছিল না। সমাজের সর্বক্ষেত্রে তাঁর সমান বিচরণ ছিল, কোনো মানুষের বিপদের খবর শুনলে যে মানুষটা সবার আগে উপস্থিত হতেন তিনি ছিলেন আমাদের রেদওয়ানুল হক।

সত্তরের দশক থেকে তাঁর সাথে পরিচয়, তিনি পারিবারিক বন্ধু ছিলেন। তিনি বাংলাদেশকে ভালোবাসতেন ভালোবেসে তাঁর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের নাম রেখেছিলেন ‘সোনার বাংলা’। তিনি আমাকে প্রায়ই বলতেন, মানুষ চাইলে সব অসাধ্য সাধন করে নিজের জীবনের ভিত্তি মজবুত করে গড়ে তুলতে পারে। তবে এজন্য যে জিনিসটি প্রয়োজন তা হলো—ধৈর্য, মনোবল ও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছার প্রবল তাড়না। আমি কী করতে চাই, কোথায় যেতে চাই—এই লক্ষ্য স্থির থাকলে গন্তব্যে পৌঁছা অবশ্যই সম্ভব। আজ তিনি আমাদের মাঝে নেই, আছে তাঁর বিশাল কর্মময় জীবনের দৃষ্টান্ত। আমরা এই কর্মের স্বীকৃতি দিতে পারলে সমাজ হবে উপকৃত। আমি মহান আল্লাহ পাকের দরবারে তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করে তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করার প্রার্থনা করছি।

একজন সমাজসেবক

আলহাজ মোহাম্মদ রেদওয়ানুল হক

জগলু মিয়া

এমন একজন মানুষকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করছি—যিনি শ্রীরামসি দিঘিরপার গ্রামে এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন-আর তাঁর নাম হচ্ছে মো. রেদওয়ানুল হক (মরহুম)। তিনি সম্পর্কে আমার মামা; আমার আব্বার ফুফাতো ভাই। মামা ছিলেন একজন সৎ-আদর্শবান মানুষ। তাঁর জীবদ্দশায় মানুষের কল্যাণে কাজ করে গেছেন। তিনি গ্রামের মানুষকে খুব ভালোবাসতেন। মানুষের বিপদে-আপদে সব সময় এগিয়ে যেতেন। তাঁর বাড়ির সামনেই মসজিদ। সেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজসহ জুমুআর নামাজ আদায় হয়। তারই পাশাপাশি শ্রীরামসি গ্রামের সকলের সহযোগিতায় একটি হাফিজিয়া মাদরাসা স্থাপন করা হয়। সেই প্রতিষ্ঠান গঠন করতে তাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে আছে। তাছাড়া গ্রামের রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ-মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা ছিল তাঁর। তিনি ছিলেন একজন পরপোকারী মানুষ।

মামা যেভাবে দেশে থাকতে সমাজের জন্য কাজ করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে বিদেশে গিয়েও দেশের মানুষের জন্য জনহিতকর কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সফল সংগঠক। লন্ডনে বসবাস করলেও তাঁর মন পড়ে থাকত দেশে। গরিব-দুঃখি মেহনতি মানুষকে সব সময় তিনি সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। লন্ডনে তিনি নিজস্ব ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতেন বাংলা টাউনের হ্যানবারি স্ট্রিটে। সেই প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিল ‘সোনার বাংলা’ রেস্টুরেন্ট। তখনকার দিনে বাঙালিদের বসার স্থান ছিল সোনার বাংলা রেস্টুরেন্টে। সকাল থেকে রাত

অবধি লোকে লোকারণ্য থাকত রেস্টুরেন্টটি। তখনকার সময় বাঙালিরা বিভিন্ন সভাসমাবেশ করতেন এখান থেকে। তিনি ছিলেন একজন সমাজসেবক। তিনি এ দেশে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ও ব্রিকলেন জামে মসজিদের সাথে জড়িত ছিলেন রেদওয়ানুল হক।

স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে চাচার অবদান

মো. মাহবুবুল হক শেরীন

বাঙালি জাতির বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের গোত্রভিত্তিক একত্রে বসবাস করার রীতি অনেক পুরানো একটি ঐতিহ্য। প্রতিটি গোত্রেই প্রজন্মভিত্তিক নেতৃত্ব দান করার যোগ্য ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত দান।

এভাবেই আমাদের গোত্রের মধ্যে প্রতি প্রজন্মেই এক বা একাধিক নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে আপন মহিমায় আমাদের গোত্রের শক্ত ভিত্তি স্থাপন এবং বংশের নাম উজ্জ্বল করে গেছেন।

সেই পরম্পরায় শ্রদ্ধাভাজন চাচা মরহুম আলহাজ রেদওয়ানুল হক (আমার আব্বার আপন চাচাতো ভাই) ষাটের দশক থেকে তাঁর মৃত্যু (২০১০ খ্রি.) পর্যন্ত নিজে ব্যক্তিগতভাবে এবং বংশের জন্য অনেক কিছু করে গেছেন, যা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

চাচা মরহুম আলহাজ রেদওয়ানুল হক ছিলেন যুক্তরাজ্যের একজন সফল ব্যবসায়ী, ছিলেন যুক্তরাজ্যে মহান একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের নিবেদিতপ্রাণ একজন সফল সংগঠক। তিনি ছিলেন খুবই পরোপকারী এক ব্যক্তিত্ব। দেশে-বিদেশে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে ব্রিকলেন জামে মসজিদের সূচনালগ্ন থেকে ছিলেন জড়িত।

বাইরে থেকে দেখতে লাগত তিনি খুবই শক্ত মনের মানুষ; কিন্তু ভেতরে ছিলেন কোমল মনের অধিকারী। যে ব্যক্তি তাঁর মন জয় করে নিয়েছে, সেই ব্যক্তি চাচাকে তাঁর বিপদের সাহায্যকারী হিসেবে পেয়ে যেত, যার সাক্ষী আমি নিজে।

চাচা ছিলেন একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, বিশেষ করে মহান মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক এমএজি ওসমানীর হাতেগড়া জনতা পার্টির ছিলেন সহ-উদ্যোক্তা।

মরহুম রেদওয়ানুল হক চাচা ছিলেন খুবই অতিথিপরায়ণ। বাজারে গেলে বড়ো মাছগুলো কিনতেন, মশলাপাতি, সবজি কখনো সের হিসাবে (কেজি) না কিনে কিনতেন বস্তা হিসাবে। এগুলো শুধু পরিবার নিয়ে খেতেন না, পাড়াপড়শিসহ এলাকাবাসী হতেন এর অংশীদার।

বিশেষ করে আমাদের শ্রীরামসি গ্রামে যখনই কোনো বড়ো রাজনৈতিক বা সামাজিক অনুষ্ঠান হতো, যেখানে আসতেন অনেক জাতীয় নেতৃবৃন্দ, তাঁদের খাওয়ানোর দায়িত্ব এবং আয়োজন নিজ হাতে নিজ বাড়িতে করতেন। এদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক এমএজি ওসমানী, বাংলার সিংহপুরুষ আব্দুস সামাদ আজাদ, বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী উল্লেখযোগ্য।

তিনি ছিলেন বিশাল মনের মানুষ, ছিলেন দানশীল ব্যক্তিত্ব। যতটুকু কাছ থেকে দেখেছি—যদি কৃপণতা করতেন তাহলে বিশাল সম্পদের অধিকারী হতে পারতেন। কিন্তু না করে অকাতরে দু'হাতে বিলিয়ে গেছেন অনেক কিছু।

যার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'আকুব খাঁ' তালুকের মামলা। ১৯৭৫ সাল থেকে নিজ খরচে নিজ গোত্রের পক্ষে মামলাটি একা চালিয়ে গেছেন এবং বংশের পরিচয়ে মামলা জয় করে দিয়ে গেছেন।

চাচার মৃত্যুর পর হারিয়েছি আমরা এমন একজন অভিভাবক, যা সহজেই পূরণ হওয়ার নয়। আমি খুবই খুশি যে, চাচার মৃত্যুর পর তাঁরই সুযোগ্য উত্তরাধিকারী পুত্র মো. এমদাদুল হক টিপু এবং মো. এমলাকুল হক 'রুফিয়া রেদওয়ান' ট্রাস্ট গঠন করে জনহিতকর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। আমি তাঁদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই, তাঁরা মরহুম চাচার রেখে যাওয়া পদচিহ্ন অনুসরণ করতে পারে।

এই জীবনী লিখনে আমার স্মৃতিগুলো আলোকপাত করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমার একটা দুঃখ যে, চাচা জীবিত অবস্থায় আমাকে ৩ নম্বর মিরপুর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসেবে দেখে যেতে পারেননি। মহান আল্লাহ পাকের কাছে কায়োমনে দুআ করি, চাচা মরহুম আলহাজ রেদওয়ানুল হকসহ আমাদের গোত্রের পূর্বসূরিরা যাঁরা আজ দুনিয়াতে নেই—আল্লাহ পাক যেন তাঁদের প্রত্যেককে মাফ করে জান্নাতবাসী করেন। আ-মিন।

লেখক : চেয়ারম্যান, ৩ নম্বর মিরপুর ইউনিয়ন পরিষদ, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ।

Cherished memories

Cllr Atiqul Hoque

It's a great pleasure to share some cherished memories and guidance we've received from our uncle, Redwanul Hoque. Renowned for his tireless work ethic and dedication to the community, he's built a lasting legacy for his family, and Alhamdulillah, has achieved his goals. Growing up, we fondly remember his vibrant lifestyle, love for grand gatherings, and exquisite taste in food and celebrations. He has instilled in us valuable lessons, particularly through his passion for politics, which aimed to improve living standards, education, and infrastructure in his village.

With the best of Dua’s.

Writer : 762nd Mayor of Salisbury

A pious man

Hafiz Musleh Uddin Ahmed

A leader of the Bangladeshi diaspora in the UK, especially in East London, Mohammed Redwanul Hoque was a prominent figure in the British Bangladeshi community.

Arriving in the UK in 1959, Mr Hoque sought a better life. He worked in industries in London and Birmingham to fill labour shortages and also sent remittances to support his family back home in Bangladesh. Coming to the UK in the late 1950s, he was visibly different - unmistakably Muslim – with a language barrier that seemed insurmountable at that time.

Homesickness was neither an option nor part of his vocabulary. In those days, social gatherings outside in coffee shops were out of the question. Being away from home and deprived of traditional local foods, which were generally prepared by women still back home, they yearned for the flavours of the East… and not East London.

Thus, gradually, a confluence of many elements came together: the inherent entrepreneurial spirit; the determination to not just survive in 1950s Britain but to thrive; and a vision to bring the best of Bangladeshi culture to London through food, delicacies, sweets, and spiced chai. This led Mr Hoque to set up his own restaurant in the famous Curry Mile, which is Brick Lane.

This small, humble restaurant called Sunar Bangla became a notably special place. It was a social hub where

migrant workers gathered in the evenings and on weekends to find a sense of belonging and share their fears of the hostilities they faced. It was a place of resistance and stubbornness, as it kept its doors open despite racist graffiti and vandalism; how can a "Paki" establishment appear on the streets? But it was also a window for curious locals to experience foods, curries, spices, teas, and desserts of the kind they had never seen before.

At the time, this brave entrepreneurial move appeared harmless, a form of defiance that Bengalis could stand on their own feet and support themselves in this new country they had embraced as their own, for which they were gradually beginning to feel a sense of belonging.

Not long afterwards, Mr Hoque became involved with others in establishing Brick Lane Mosque. Upon founding the mosque, Mr Hoque decided to sponsor a young orphan to come to the UK, to realise his dream of a better life and to bring the sounds of Bangladesh to East London through his Quran recitation. This young orphan arrived in the UK in 1984 and served as an imam at Brick Lane Mosque for 11 years.

I often visited his house in his later years, as he would regularly invite my father for Iftar and other occasions. My father always ensured I knew about his roots, for that helps me understand my own. I remain very close to Mr Hoque's children and even his grandchildren. He passed away in 2010 at the Royal London Hospital in Whitechapel. I pray Allah illuminates his grave and rewards him for his pioneering sacrifices and the lifelong connections he fostered for people.

My name is Musleh Uddin. I studied law at Clare College, Cambridge, and I am a practising solicitor qualified in England. By the grace of God, I am a Hafiz of the Qur'an, a student of the Deen, and a servant at a small local mosque in East London.

THE BRICK LANE JAMME MASJID TRUST (London) Limited

59 Brick Lane, London E1 6QL | Tel: 020 7247 6052 / 020 7247 3757
Email : info@bricklanejammemasjid.org.uk | Website : www.bricklanejammemasjid.org.uk

Date:

16 October 2025

I am delighted to write about Al-haj Redwanul Haque who is personally known to me through his various community involvements. I also know that he has been involved with the Brick Lane Jamme Masjid Trust since the beginning of this organisation. As far as I remember he was the Assistant Treasurer of the Management Committee of this Masjid. Mr Haque was also involved with the historic Bangladesh Welfare Association UK and the Bangladesh Centre London.

Al-haj Redwanul Haque was deeply involved in community works and he has contributed towards achieving harmonious community relations. With all his involvements he did a lot for the community which have got a very positive impact in our multicultural society.

He was a man of good character and a charitable nature. He was highly respectable person in our community with his honesty and friendliness.

Hamidur Rahman Choudhury
President
The Brick Lane Jamme Masjid Trust (London) Ltd

DIGHIR PAR DEVELOPMENT
AND WELFARE ASSOCIATION

Level One B, 46 Hanbury Street, London E1 5JL UK
Email: sreeramshi.ddwa@gmail.com
Contact number: 07542 520407

Date: 06/11/2025

Tribute to Late Al-Hajj Redwanul Hoque

The Dighir Par Development and Welfare Association (DDWA) is deeply honoured to present this tribute to the **Late Al-Hajj Redwanul Hoque,** a devoted and highly respected member of our tribe and community.

For several decades, Late Redwanul Hoque served as a senior member of our tribe. His unwavering enthusiasm and passion for the welfare of his people were widely recognised and deeply admired. It is difficult to refer to him in the past tense—he was truly a force of nature whose influence and contributions remain immeasurable.

Upon his arrival in the United Kingdom during the 1960s, he settled in Walsall, Birmingham. His compassion and generosity quickly became evident. At a time when many arrivals from East Pakistan faced hardship and uncertainty, he opened his own home to those in need, providing accommodation and meals free of charge until they could support themselves.

From the 1970s onwards, Late Redwanul Hoque became a prominent figure within the Bangladeshi community in East London. He was instrumental in mobilising support to establish the Brick Lane Jamme Masjid Trust, serving as its first joint Treasurer. He also made significant contributions to the development of the Bangladesh Welfare Association UK.

His devotion to his motherland was equally profound. When he left the country which was then East Pakistan, he maintained strong ties to his homeland. During the Bangladesh Liberation War in the early 1971s, he was actively involved in supporting the freedom movement. Following ten months of struggle, Bangladesh achieved its independence. His patriotism was reflected even in his business endeavours—his restaurant at 46 Hanbury Street, London E1, was aptly named ***The Shunar Bangla Restaurant*** ("Golden Bengal"). By 1971, he had become one of the most respected leaders within the Bangladeshi community in East London.

In 1975, he played a key role in the Dighir par, ***Talook*** case in Bangladesh having been entrusted by senior figures of the village to lead the matter.

DIGHIR PAR DEVELOPMENT AND WELFARE ASSOCIATION

Level One B, 46 Hanbury Street, London E1 5JL UK
Email: sreeramshi.ddwa@gmail.com
Contact number: 07542 520407

During the 1980s, he emerged as a leading member of the ***Jathio Jonotha Party,*** maintaining a close association with **General M.A.G. Osmani** in Bangladesh, as one of the party's Organisers in London, he coordinated visits and exchanges between the UK and Bangladesh, further strengthening ties between the diaspora and the homeland.

By the 1990s, health concerns prompted him to reduce his public activities, yet he remained deeply engaged in the affairs of his tribe and his beloved village of Dighir Par.

In the 2000s, he became one of the founding members of the ***Dighir Par Development and Welfare Association (DDWA).*** His vision was to enhance the quality of life for the residents of Dighir Par and Sreeramshi in Bangladesh, while fostering unity and mutual support among tribal members at home and abroad. His dedication to this mission endures as his lasting legacy.

Late Redwanul Hoque was a man of great integrity and compassion. His lifelong commitment to charitable work and community welfare contributed significantly to the advancement of multicultural harmony in Britain.

In 2010, Late Al-Hajj Redwanul Hoque passed away. The people of Dighir Par, along with all who knew him, owe him profound respect and gratitude for his lifelong service and contributions.

His legacy will continue to inspire future generations.

May Allah Subhanahu wa`tala grant him the highest place in Jannatul Ferdaus
A`meen

Muhammad Harun Miah

Chairman

On behalf of Dighir par Development and Welfare Association

আপনজনের
স্মৃতির আলোয়

এই অধ্যায়ে প্রিয়জনদের স্মৃতিচারণে রেদওয়ানুল হকের পারিবারিক জীবন মানবিক রূপ ও ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলো তোলে ধরা হয়েছে

আমাদের সময়, আমাদের জীবন

রুফিয়া বেগম

আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শুরু হয় ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে, যখন আমার বয়স ১৭ বছর। তখন পারিবারিকভাবে আমার (মরহুম) স্বামীর সঙ্গে আমার বিয়ে সম্পন্ন হয়। তিনি সম্পর্কে আমার চাচাতো ভাই ছিলেন। কিন্তু ধর্মীয় অনুশাসন ও শালীনতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধার কারণে বিয়ের আগে আমাদের কখনো সামনাসামনি দেখা হয়নি। পর্দা ও ধর্মীয় বিধিনিষেধ আমরা আন্তরিকতার সাথে পালন করতাম।

আমার ভাশুর ও শাশুড়ি যখন বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আমার বাবা-মায়ের কাছে যান, তখন প্রথমে তাঁরা পুরোপুরি রাজি ছিলেন না। কারণ আমার স্বামীকে সবাই রাগি ও জেদি মানুষ হিসেবে চিনত। অনেকে তাঁকে ভয় পেতেন। তার ওপর আমাদের বয়সের ব্যবধানও ছিল অনেক, তিনি আমার প্রায় পনেরো বছরের বড়ো ছিলেন। তাই বাবা-মা সরাসরি আপত্তি না জানিয়ে শর্ত দেন--দশ ভরি স্বর্ণালংকার এবং কাবিননামায় আরও জমিজমা দিতে হবে। তখনকার দিনে কেউ এখনকার মতো পুরো স্বর্ণের সেট দিতেন না। তাই তাঁদের ধারণা ছিল, এতে হয়তো বিয়ের প্রস্তাব আর এগোবে না। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় তা হয়নি; বরং তাঁরা এগারো ভরি স্বর্ণালংকার দেন এবং কাবিননামায় আরও কিছু সম্পত্তি যোগ করেন। এরপরই আমাদের বিয়ে হয়।

আমাদের সময়ে আত্মীয়ের মধ্যে বিয়েশাদি ছিল একেবারেই স্বাভাবিক ব্যাপার। চাচাতো বা মামাতো ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ে তখন কারো চোখে বিস্ময়ের কিছু ছিল না; বরং পরিচিত পরিবারে মেয়ে বিয়ে দেওয়াকে মানুষ নিরাপত্তা আর ভরসার জায়গা বলেই মনে করত। আমি আর আমার স্বামী যে চাচাতো ভাই-বোন ছিলাম, সেটি তখন কোনো আলোচনার বিষয়ই ছিল না—না লজ্জার, না অস্বস্তির। কিন্তু সময়

বদলেছে, সমাজ বদলেছে, বদলেছে প্রজন্মের ভাবনা। আজ আমার নাতি-নাতনিরা যখন গল্প করতে গিয়ে এই কথাটা শোনে, তখন ওদের চোখ বড়ো হয়ে যায়। কেউ হেসে বলে, 'দাদু, তুমি কীভাবে তোমার ভাইকে বিয়ে করলে?' তারা অবাক হয়ে বলে, 'ইয়াক! আমরা তো সবাই কাজিনরা এত ক্লোজ–একসঙ্গে খেলি, ঝগড়া করি, গোপন কথা শেয়ার করি–এটা কীভাবে সম্ভব?' ওদের এই হাসাহাসি আর বিস্ময় দেখে আমি কখনো কখনো নিজেও হেসে ফেলি। মনে হয়, সত্যিই তো–ওদের চোখ দিয়ে দেখলে বিষয়টা একটু আজবই লাগে।

আমি বুঝি, ওদের অস্বস্তি আসলে অস্বস্তি নয়, বরং আশ্চর্য। ওদের বেড়ে ওঠা হয়েছে একেবারে ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন সমাজে। ওদের কাছে কাজিন মানেই ভাই-বোনের মতো আপন মানুষ। তাই বিয়ের কথা কল্পনাতেই আসে না। সেজন্যই ওরা আমাকে নিয়ে মজা করে, হালকা ঠাট্টা করে–আর আমি সেই ঠাট্টায় রাগ করি না; বরং ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে বলি, 'আমাদের সময়টা ছিল আলাদা, তোমাদের সময়টা ভিন্ন।' আমরা তোমাদের মতো কখনো একসঙ্গে বসে আড্ডা দিইনি এমনকি কেউ কাউকে দেখিনি পর্যন্ত! আমি বুঝি–ওদের বেড়ে ওঠা, শিক্ষা, সমাজ আর চিন্তাভাবনা সম্পূর্ণ ভিন্ন বাস্তবতার ভেতর দিয়ে। তাই ওদের অনুভূতিকে আমি দোষ দিই না; বরং মনে করি, প্রজন্মের ব্যবধানের কারণে এই বৈচিত্র্য স্বাভাবিক।

আমার কাছে এই গল্প লজ্জার নয়; বরং স্মৃতির। এটা আমার সময়ের ইতিহাস, আমার জীবনের সত্য। সেই বাস্তবতার ভেতরেই আমি ভালোবাসা পেয়েছি, সম্মান পেয়েছি, একটি পরিপূর্ণ সংসার গড়েছি। হয়তো আমার নাতি-নাতনিরা সবকিছু বুঝবে না, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি–ভালোবাসা, সততা আর দায়িত্ববোধ কখনো পুরানো হয় না। প্রজন্ম বদলায়, ভাবনা বদলায়, কিন্তু মানুষের হৃদয়ের টান সেই একই থেকে যায়।

যাঁকে সবাই কঠিন মানুষ ভাবত, তিনি আমার জীবনে ছিলেন একেবারেই আলাদা। আমাদের দাম্পত্য জীবনে কখনো বড়ো কোনো ঝগড়া হয়নি, কিংবা তিনি কখনো আমাকে অসম্মান করেননি। তিনি সবসময় আমাকে সম্মান ও ভালোবাসায় আগলে রেখেছেন। পরিবার ছিল তাঁর জীবনের মূল শক্তি। আত্মীয়স্বজন নিয়ে একসঙ্গে থাকতে তিনি ভীষণ

ভালোবাসতেন। আমার বড়ো ভাই, যিনি বয়সে আমার স্বামীর থেকে অনেক ছোটো ছিলেন, তাঁকেও গভীর মূল্যায়ন করতেন এবং প্রায় সব বিষয়ে তাঁর পরামর্শ নিতেন। আমার বাবা ও চাচারাও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাঁ মতামত জানতে চাইতেন।

বিয়ের চার-পাঁচ বছর পর আমাদের প্রথম সন্তান জন্ম নেয়। তখন তিনি বিলেতে ছিলেন এবং দেশে চলছিল স্বাধীনতার সংগ্রাম। তিনি স্বাধীনতার পক্ষে সক্রিয় সংগঠক হওয়ায় দেশে ফেরা ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। তখনকার দিনে আজকের মতো সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না। এর ফলে প্রথম সন্তানের জন্মের খবরও তিনি অনেক দেরিতে পান। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি যখন বাড়ি ফেরেন, তখন ছেলের বয়স প্রায় সাড়ে তিন বছর। সে বার তিনি বিলেত থেকে গ্রামের সকল আত্মীয়স্বজনের জন্য কাপড়চোপড়, ঘরের সবার জন্য বাসনপত্র ও ডিনার সেটসহ অনেক কিছু নিয়ে আসেন। অবশ্য প্রতিবারই দেশে ফেরার সময় তিনি সবার জন্য নানা রকম উপহারসামগ্রী নিয়ে যেতেন।

বাংলাদেশে তাঁর ভাইদের পরিবারসহ যৌথ পরিবারে আমরা থাকতাম। আমাদের বিলেতে নিয়ে আসার সময় তাঁর ইচ্ছে ছিল, নিজের সন্তানের মতো করে ছোটো ভাইয়ের ছেলেকেও সঙ্গে নিয়ে আসবেন। কিন্তু দুঃখজনকভাবে জটিলতার কারণে আমাদের সবার আবেদনই বাতিল হয়। ততদিনে আমাদের চার সন্তানের জন্মই বাংলাদেশে হয়। ১৯৮৯ সালে তিনি আমাকে ও আমাদের চার সন্তানকে বিলেতে নিয়ে আসেন। এখানে আমরা হ্যানবারি স্ট্রিটস্থ রেস্টুরেন্ট 'সোনার বাংলা'-র ওপরে একটি ফ্ল্যাটে থাকতাম এবং নিচে তিনি তাঁর ব্যবসা পরিচালনা করতেন।

ইংল্যান্ডে আসার তিন-চার বছর পর তিনি এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হন। এ ঘটনায় প্রায় এক বছর তিনি প্যারালাইজড অবস্থায় ছিলেন। ডাক্তার এবং আমরা কেউই আশা করতে পারিনি তিনি আবার সুস্থ হবেন। কিন্তু আল্লাহর অশেষ রহমতে ধীরে ধীরে তিনি সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবন ফিরে পান।

জীবনের যে-কোনো সিদ্ধান্ত নিতে তিনি দৃঢ় ও সক্ষম ছিলেন। একবার কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর তিনি কখনো পিছপা হননি। সুস্থ হয়ে তিনি বাংলাদেশে গিয়ে আমাদের বড়ো মেয়ের বিয়ের পাকাকথা দিয়ে আসেন। কথা ছিল, পরের বছর আমরা দেশে গিয়ে সেখানেই

মেয়ের বিয়ে দেব। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় কয়েক মাসের মধ্যেই মেয়ের শ্বশুর-শাশুড়ি ও জামাই ইংল্যান্ডে বেড়াতে আসেন এবং এখানেই তাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়। এর তিন বছর পর তিনি আবার দেশে গিয়ে নিজের পছন্দমতো জায়গায় বাকি তিন সন্তানের বিয়ে ঠিক করেন। সন্তানেরাও এতে আপত্তি করেনি। ছয় মাসের মধ্যে সকল বিয়ে সম্পন্ন করেন। আলহামদুলিল্লাহ, আজ সবাই ভালো আছে।

তিনি উপলব্ধি করে ছিলেন যে, সন্তানদের প্রজন্ম আর তাঁর প্রজন্মের চিন্তাধারা, মানসিকতা ও সামাজিক জীবন এক নয়। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নেন, আমাকে নিয়ে তিনি বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে থাকবেন, আর সন্তানেরা ইংল্যান্ডে নিজেদের পরিবার নিয়ে নিজেদের পছন্দমতো জীবন গড়বে। সেই কারণে আমরা প্রতি বছর একবার করে দুই-তিন সপ্তাহের জন্য ইংল্যান্ডে আসতাম, সন্তানদের দেখে আবার দেশে ফিরে যেতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ২০০৮ সালে আমরা আবার ইংল্যান্ডে আসার পর তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাক্তাররা তাকে দীর্ঘ ভ্রমণে নিষেধ করেন। একারণে তিনি আর প্রিয় দেশে ফিরতে পারেননি।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত দেশপ্রেমিক। দীর্ঘদিন প্রবাসে থেকেও আমৃত্যু তিনি বাংলাদেশি পাসপোর্টই ধারণ করেছেন। কখনো ব্রিটিশ পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেননি। সে কারণে আমাদের প্রতি দুই বছরের মধ্যেই ইংল্যান্ডে ফিরে আসতে হতো ভিসা টিকিয়ে রাখার জন্য। তাঁর দেশপ্রেমে কখনো বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি। দেশপ্রেম থেকেই তিনি এক সময় প্রবাসীদের অধিকার আদায়ে এগিয়ে আসেন। ১৯৯৫ সালে তিনি প্রবাসীদের দাবিদাওয়া নিয়ে ঢাকা হাইকোর্টে রিট দায়ের করেন। তাঁর অন্যতম প্রধান দাবি ছিল প্রবাসীদের ভোটাধিকার। আজ প্রায় ত্রিশ বছর পর সেই দাবি বাস্তবায়নের পথে এসেছে–শুনেছি, ২০২৬ সালের নির্বাচনে প্রবাসীরা ভোট দিতে পারবেন। আফসোস, তিনি নিজ চোখে এই অর্জন দেখে যেতে পারেননি। যদিও এই আইনে তাঁর নামের কোনো স্বীকৃতি নেই, তবুও এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান দাবিদার হিসেবে তাঁর নাম ইতিহাসে উল্লেখ থাকবে।

বিলেতে তিনি সবসময় বাঙালি কমিউনিটির কথা ভাবতেন। ব্রিকলেন মসজিদ প্রতিষ্ঠায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বাংলাদেশ সেন্টারসহ বিভিন্ন বাঙালি কমিউনিটি কার্যক্রমে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।

সামাজিক ও রাজনৈতিক যে-কোনো দাবিদাওয়ার আন্দোলনে তাঁকে সামনে দেখা যেত। তিনি বিলেতে জাতীয় জনতা পার্টির আন্তর্জাতিক সংগঠক ছিলেন। মানুষের সঙ্গে থাকতে, মিটিং করতে, ঘরে বা রেস্টুরেন্টে আলোচনাসভা আয়োজন করতেন তিনি খুব ভালোবাসতেন। আতিথেয়তা ছিল তাঁর স্বভাব–ঘরে ফিরলেই প্রায়ই কাউকে না কাউকে সঙ্গে নিয়ে আসতেন।

ব্রিটেনে কমিউনিটির অনেক সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। যেমন--সৈয়দ সাহেব, জনাব গোলাম মোস্তফা সাহেব, জনাব খালিসদার সাহেবসহ আরও অনেকে। সবার নাম এখন মনে পড়ে না, কিন্তু সকলেই তাঁর আন্তরিকতা ও নেতৃত্বকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

২০১০ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। পরে আমরা তাঁর মরদেহ বাংলাদেশে নিয়ে গিয়ে তাঁর প্রিয় গ্রামেই তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত করি। তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তাঁর ভালোবাসা, দেশপ্রেম, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও সংগ্রামী জীবনের স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে চিরকাল অম্লান হয়ে থাকবে।

লেখক : রেদওয়ানুল হকের স্ত্রী।

কুরআনুল করিমের আশিক মরহুম আলহাজ রেদওয়ানুল হক (রাহ.) স্মরণে

মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার। অসংখ্য দুরুদ ও সালাম প্রেরণ করছি হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দরবারে। সালাম প্রেরণ করছি তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবায়ে কেরাম সমীপে। কলম ধরেছি বিশিষ্ট কুরআনপ্রেমিক রেদওয়ানুল হক (রাহ.)-এর সম্পর্কে কিছু লেখার জন্যে। 'কুল্লু নাফসিন জাইকাতুল মাওত।' 'অর্থাৎ, সমস্ত প্রাণীকেই একদিন মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করতে হবে। সৃষ্টিজগতে আল্লাহ পাক যত মাখলুক সৃষ্টি করেছেন সবাইকেই একদিন মরণের স্বাদ পেতে হবে। এই পৃথিবীতে আমরা কেউই স্থায়ী নয়। সারা জীবন বসবাস করতে পারব না। নির্দিষ্ট সময়ে দুনিয়ার সফর শেষ করে চলে যেতে হবে পরপারে। এর মাঝেও কিছু মানুষ এমন হয় যারা মরে গিয়েও অনেক দিন মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকে। শ্রীরামসি জামে মসজিদের সাবেক মুতাওয়াল্লি, মরহুম আলহাজ রেদওয়ানুল হক ছিলেন এমনই একজন ব্যক্তি। যিনি ছিলেন আমার দেখামতো একজন সত্যিকারের কুরআনপ্রেমিক। আলেম-উলামা ও হাফিজে কুরআনদের তিনি আন্তরিক মায়ামহব্বত এবং স্নেহ করতেন।

আজ সেই কুরআনপ্রেমিক ব্যক্তিকে নিয়ে কিছু কথা বলার জন্য কলম ধরেছি, যদিও আমি কোনো লেখক নই, শুধু হাজি রেদওয়ানুল হকের দুয়েকটা স্মৃতিচারণমূলক কথা উল্লেখ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

সম্ভবত ২০০৮ সালের কথা। শ্রীরামসি দিঘিরপার জামে মসজিদে আমার তারাবির নামাজ পড়ানোর সুযোগ হয়।

কুরআনুল কারিমের খাতিরে তাঁর ভাই সুলেমানুল হক আমাকে আন্তরিক মহব্বত করতেন। তাঁর সন্তানরাও এখনো আমাকে মহব্বত করেন।

সুলেমান হকের মাধ্যমে রেদওয়ানুল হকের সাথে আমার পরিচয় হয় এবং দুই তিনবার শ্রীরামসি দিঘিরপার মসজিদে তারাবিহের নামাজ পড়ানোর সুযোগ হয়। সেই মসজিদে নামাজ পড়িয়েছি, সেই সময় দেখেছি কুরআনের প্রতি তাঁর মহব্বত, আলিম-উলামা ও হাফিজদের প্রতি তাঁর উদার মন। অত্যন্ত বড়ো মনের মানুষ ছিলেন তিনি। আমি অধমকে যে মহব্বত করেছেন, সেটা কখনো ভোলার মতো নয়।

একবার এমন হয়েছিল যে, কারণবশত তারাবির নামাজ তাঁর বাড়িতে পড়ার ব্যবস্থা করা হয়। প্রচণ্ড গরম ছিল। নামাজ চলাকালীন তিনি তাঁর দিকের ঘুরানো ফ্যানটা আমার দিকে ঘুরিয়ে দেন। অথচ তিনি নিজে ঘেমে সমস্ত শরীর থেকে টপটপে ঘাম বের হচ্ছে। তিনি বললেন আমার কষ্ট হলেও সমস্যা নেই, আমার হাফিজের যেন কোনো কষ্ট না হয়। এটা ছিল কুরআনের হাফিজদের প্রতি তাঁর মহব্বতের একটা নমুনা।

তিনি অসুস্থ হলে আমি যখন দেখতে যাই, অসুস্থ অবস্থায়ও আমাকে মহব্বত করতেন। তাঁর ছেলেরাও এখনো আমাকে মায়ামহব্বত করেন, বাবার কাছ থেকে দেখে তাঁরাও আমাকে মহব্বত করেন। আল্লাহ পাক তাঁদের এই মহব্বত আল্লার ওয়াস্তে বানিয়ে কবুল করুন। আ-মিন।

আমার আম্মা ২০১০ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে ৯ তারিখে ইন্তেকাল করেন। মার্চ মাসে আমার আম্মার শিরনিতে আমি রেদওয়ানুল হককে শিরনির দাওয়াত দিই। শুনে তিনি অনেক খুশি হলেন এবং আমাকে বললেন, আমার বিকাশ নাম্বার দেওয়ার জন্য। আমি বলেছিলাম, হাজি সাহেব, শুধু আমার আম্মার জন্য দুআ করবেন। কিছু লাগবে না। তিনি আমার আম্মার শিরনিতে পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে শরিক হন। আল্লাহ তা'আলা এই দানকে কবুল করুন। আ-মিন।

একদিন রেদওয়ানুল হক হলিয়ারপাড়া জামে মসজিদে নামাজ পড়া শেষে নুরানি চেহারার এক ব্যক্তিকে দেখতে পান, তিনি ছিলেন হলিয়ারপাড়ার বড়ো হুজুর। তিনি জিজ্ঞেস করলেন আপনি কী করেন? বড়ো হুজুর বললেন, আমি ৩০ পারা কুরআনের হাফিজ। তখন রেদওয়ানুল হক হুজুরকে দাওয়াত করলেন। হুজুর দাওয়াতে তশরিফ আনেন। গিয়ে দেখেন রেদওয়ানুল হক তাঁর নিজের পালিত ঘরের বড়ো গরুটি আল্লাহর ওয়াস্তে জবাই করেছেন দাওয়াতি মেহমানদের জন্য। এটা

দেখে বোঝা যায় যে, কুরআনের হাফিজদের প্রতি তাঁর ছিল আন্তরিক মায়ামহব্বত।

রেদওয়ানুল হক যেমন ছিলেন কুরআনপ্রেমিক, তেমনি ছিলেন দেশপ্রেমিক। তিনি ১৯৬৮ সালে লন্ডনের মাটিতে 'সোনার বাংলা রেস্টুরেন্ট' নাম দিয়ে রেস্টুরেন্ট খুলেছিলেন। দেশের প্রতি ভালোবাসা থেকে তিনি বাংলাদেশ হওয়ার আগেই সোনার বাংলাকে লন্ডনের মাটিতে প্রচার করেছিলেন। সিলেটে বন্দরবাজারে সোনার বাংলা নামে একটি রেস্টুরেন্ট খুলেছিলেন। দেশের প্রতি এমন প্রেম নিশ্চয়ই রাসুল সা.-এর দেশপ্রেম থেকে প্রাপ্ত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর মাতৃভূমি মক্কাকে খুবই ভালোবাসতেন। মক্কা ছেড়ে যাওয়ার সময় তিনি মক্কার দিকে বার বার ফিরে ফিরে তাকাতেন আর কাঁদতেন। দেশপ্রেমও ঈমানের একটা নিদর্শন। যেমন বলা হয়েছে—'হুব্বুল ওয়াতানি মিনাল ঈমান।'

তিনি ইমাম-মুয়াজ্জিন, আলিম-উলামা, বিশেষ করে হাফিজে কুরআনদের অনেক মহব্বত করতেন। তাঁদেরকে পরমাত্মীয় হিসেবে হৃদয়ে স্থান দিয়েছিলেন।

একদিন আমি রেদওয়ানুল হককে বলেছিলাম আমার এলাকায় অসহায়-গরিব মানুষ আছে। আপনি আর্থিক সাহায্য করলে আমার এলাকার অসহায়-গরিব মানুষ অনেক উপকৃত হবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাকে অনেক টাকা দিয়ে বললেন, হাফিজ সাব, আপনি এই টাকাগুলো আপনার এলাকার গরিব মানুষকে দেবেন।

এছাড়াও এলাকার এবং দূরদুরান্ত থেকে আগত অসহায়-গরিব মানুষকে অনেক সহযোগিতা করতেন।

আল্লাহ পাক কুরআনপ্রেমিক রেদওয়ানুল হক (রাহ.)-এর আখেরাতের জীবনকে উজালা করুন। জান্নাতুল ফেরদাউসের বাসিন্দা হিসাবে কবুল করুন। তাঁর আওলাদদের দুনিয়া-আখেরাতে কামিয়াবি নসিব করুন। আ-মিন

লেখক : হাফিজ আব্দুল কাইয়ুম, প্রধান শিক্ষক: হজরত শাহ জালাল রহ. দারুল কুরআন মাদরাসা নজিপুর, মিরপুর, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ।

রেদওয়ানুল হক ছিলেন একজন নিবেদিত সমাজসেবক

জেনিথ রহমান

রেদওয়ানুল হক ছিলেন এক নীতিবান ও সমাজহিতৈষী পুরুষ। মেজাজ যদিও কড়া ছিল, তবে তিনি ছিলেন প্রবল ব্যক্তিত্ববান। অন্তর ছিল কোমল। মানুষকে ভালোবাসা, কাউকে সাহায্য করা সর্বোপরি দেশকে ভালোবাসতেন তিনি। বলার অপেক্ষা রাখে না, রেদওয়ানুল হক ছিলেন লন্ডন প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে সুপরিচিত নাম। তিনি শুধু একজন সফল ব্যবসায়ী নন, বরং প্রবাসী সমাজের কল্যাণে নিবেদিত একজন সমাজসেবকও বটে। লন্ডনে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত সোনার বাংলা রেস্টুরেন্ট বহু বছর ধরে বাংলাদেশিদের আড্ডা, সংস্কৃতি বিনিময় এবং অতিথিপরায়ণতার অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। প্রবাসে বাঙালিদের মিলনস্থল হিসেবে এটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। লন্ডনের স্থানীয় ব্রিটিশ নাগরিকরাও সোনার বাংলা রেস্টুরেন্টে এসে বাঙালি সংস্কৃতি ও খাবারের স্বাদ গ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও আতিথেয়তার সেতুবন্ধন তৈরি করেন। রেদওয়ানুল হক প্রবাসীদের সামাজিক সমস্যা সমাধান, তরুণ প্রজন্মকে সঠিক পথে পরিচালনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন এবং দাতব্য কার্যক্রমে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। তিনি সর্বদা চেষ্টা করেছেন প্রবাসী নতুন প্রজন্ম যেন তাদের শেকড়, অর্থাৎ—বাংলাদেশি সংস্কৃতি ও ইতিহাসের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। এজন্য বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং সহযোগিতা করেছেন। এছাড়াও বাংলাদেশের উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কাজে রেদওয়ানুল হক সবসময় সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো—তিনি কখনো নিজেকে কেবল ব্যবসায়ী হিসেবে সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং কমিউনিটির প্রতিটি প্রয়োজনে তিনি ছিলেন সবার পাশে। লন্ডনের সোনার বাংলা রেস্টুরেন্ট কেবল একটি খাবার ঘর নয়, বরং প্রবাসী বাংলাদেশিদের ইতিহাস ও স্মৃতির অংশ হয়ে দাঁড়ায়।

লেখক : উদ্যোক্তা, সমাজকর্মী এবং টাওয়ার হ্যামলেটস বার কাউন্সিলের নির্বাচিত লেবার কাউন্সিলর ও ডেপুটি স্পিকার

বেয়াই রেদওয়ানুল হক

মুমিনুর রহমান চৌধুরী

সময় অদ্ভুত এক জিনিস। কোনো কোনো সম্পর্ক জীবনের খুবই স্বল্প সময়ে গড়ে ওঠে। অথচ তাদের প্রভাব, প্রজ্ঞা ও স্মৃতির গভীরতা আজীবন হৃদয়ে রয়ে যায়। আমার বেয়াই রেদওয়ানুল হক তেমনই একজন মানুষ—যিনি আমার জীবনে আসেন আত্মীয়তার সূত্র ধরে। কিন্তু রেখে যান অনেক বড়ো এক প্রভাব—মানবিকতায়, দেশপ্রেমে ও পারিবারিক মূল্যবোধে।

আমার সাথে রেদওয়ানুল হকের প্রথম পরিচয় ২০০০ সালে, যখন আমি বাংলাদেশে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলাম। সেদিন তিনি আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন তাঁর বড়ো ছেলের জন্য আমার ছোটো ভাইয়ের বড়ো মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। মানুষটিকে প্রথম দেখাতেই আমার খুব ভালো লেগেছিল। তাঁর মধ্যে ছিল একধরনের সহজ-সরল সৌন্দর্য, এক আত্মিক উষ্ণতা। তাঁর আচরণে কোনোরকম কৃত্রিমতা ছিল না। ছিল একদম খাঁটি একজন মানুষ হওয়ার ছাপ। সেই প্রথম সাক্ষাৎ থেকেই অনুভব করেছিলাম তিনি মিশুক, আন্তরিক এবং অসাধারণ অতিথিপরায়ণ একজন মানুষ।

আত্মীয়তা ও কাছ থেকে দেখা মানুষটি

আমার ভাতিজির বিয়ের পর আত্মীয়তা হওয়ার সুবাদে তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। বেশ কয়েকবার দেখাও হয় বিলেতে। তখন তিনি অধিকাংশ সময় বাংলাদেশেই থাকতেন। বিলেতে বছরে কেবল মাস দুয়েকের জন্য আসতেন। মূলত বাংলাদেশে তাঁর দীর্ঘদিনের চলমান কিছু গুরুত্বপূর্ণ মামলা ছিল। এই মামলাগুলো তিনি শুধু নিজের জন্য নয়, বরং তাঁর পরিবারের সম্মান, মর্যাদা ও ন্যায়ের পক্ষে লড়াই হিসেবে দেখতেন। বেয়াইয়ের দেশপ্রেম ছিল প্রবল। অনেকে অবসরে বিলেতে স্থায়ী হয়ে

যান। কিন্তু তিনি বাংলাদেশের মাটিতেই নিজেকে খুঁজে পেতেন। জীবনের শেষ প্রান্তে নিজের শেকড়ের কাছে-দেশের কাছে থাকতে চেয়েছিলেন। শৌখিনতা, অতিথিপরায়ণতা ও সাংস্কৃতিক চেতনা বেয়াইয়ের ছিল উঁচু মাত্রায়। বিশেষ করে খাবার নিয়ে তাঁর একটা শৌখিনতা ছিল। কিন্তু সেটা ছিল পরিশীলিত এবং স্বাদ-সর্বস্ব, বাহুল্য নয়। ভালো রান্না, দেশীয় স্বাদ এবং বাঙালিয়ানা খাবার পরিবেশন করায় তাঁর আনন্দ ছিল। কেউ যদি হঠাৎ তাঁর বাড়িতে চলে যেতেন, নিশ্চিত তাঁর আতিথেয়তায় অভিভূত হতেন। বেয়াইয়ের এই গুণটি পরিবার-পরিজনের মধ্যেও একধরনের ভালোবাসা ও সামাজিক সম্প্রীতি ছড়িয়ে দিত।

ধর্মীয় অবদান

লন্ডনের ব্রিকলেন এলাকায় একটি পরিত্যক্ত সিনাগগকে যখন মসজিদে রূপান্তরিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়, তখন রেদওয়ানুল হক ছিলেন সেই ঐতিহাসিক উদ্যোগের অন্যতম অগ্রপথিক। গোলাম মোস্তফা, শামসুদ্দিনসহ আরও অনেকের সঙ্গে তিনিও সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন এই মহৎ কাজে। এই মানুষগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আজ ব্রিকলেনের মসজিদ শুধু নামাজের স্থান নয়; বরং ব্রিটিশ-বাংলাদেশি মুসলিম কমিউনিটির জন্য একটি সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতীক। আজ এই মানুষদের অনেকেই আমাদের মাঝে নেই। আমার প্রার্থনা, মহান আল্লাহ যেন তাঁদের সকলকে বেহেশতের মেহমান হিসেবে কবুল করেন।

ঐতিহ্যবাহী মনোভাব ও সময়ের প্রতি শ্রদ্ধা

রেদওয়ানুল হক ছিলেন গণতান্ত্রিক রীতিনীতিতে বিশ্বাসী একজন মানুষ। তিনি সমাজের পুরাতন মূল্যবোধ ও রীতিকে গুরুত্ব দিতেন এবং নিজের জীবনেও তা বাস্তবায়ন করতেন। তিনি মনে করতেন সময়ের পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু পারিবারিক ঐতিহ্য, নৈতিকতা ও সামাজিক শৃঙ্খলার ভিত্তি পরিবর্তন হওয়া উচিত নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে পরিবারের ছোটো-বড়ো সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। বেয়াই ছিলেন এক আদর্শ ব্যক্তিত্ব, যাঁর সিদ্ধান্তে ভার থাকত, যুক্তি থাকত এবং সবচেয়ে বড়ো কথা—ভালোবাসা থাকত।

মুক্তিযুদ্ধের সময় অনন্য অবদান

একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বিলেতের বাঙালিদের মাঝে যে উৎসাহ, আবেগ ও আত্মনিবেদন দেখা গিয়েছিল, তাঁর অন্যতম কেন্দ্র ছিল

রেদওয়ানুল হকের মালিকানাধীন হ্যানবারি স্ট্রিটের 'সোনার বাংলা' রেস্টুরেন্ট। এই রেস্টুরেন্ট ছিল এক ধরনের মিলনকেন্দ্র। সেখানে যুদ্ধের সমর্থনে আলোচনাসভা হতো, তহবিল সংগ্রহ চলত, দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রবাসীদের মাঝে চেতনার বীজ বপন হতো। এই রেস্টুরেন্টে জেনারেল এমএজি ওসমানী, আব্দুস সামাদ আজাদসহ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ও পরবর্তীকালে বাংলাদেশের প্রথিতযশা রাজনীতিবিদ, সংস্কৃতিসেবী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের নিয়মিত উপস্থিতি থাকত। রেস্টুরেন্টটি কেবল খাওয়াদাওয়ার স্থান ছিল না, বরং তা হয়ে ওঠেছিল একধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক ও চেতনার কেন্দ্র। বেয়াইয়ের এই অবদান নিঃসন্দেহে প্রবাসী বাঙালিদের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

পারিবারিক মানুষ হিসেবে

পারিবারিক দায়িত্ব পালনেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত যত্নবান। নিজের সন্তানদের তিনি শুধু শিক্ষিতই করেননি; তাদের মধ্যে বাঙালি সংস্কৃতি, ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং পারিবারিক ঐক্য গেঁথে দিয়েছিলেন। আত্মীয়স্বজনের প্রতি তাঁর দায়িত্ববোধও ছিল অনুকরণীয়। তিনি যে একটি সংগঠিত ও সুশৃঙ্খল পরিবার রেখে গেছেন, এটাই তাঁর জীবনের সফলতার প্রমাণ।

বিদায়বেলায়

রেদওয়ানুল হক আজ আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব, স্মৃতি ও কাজ আমাদের মাঝে জ্বলন্ত। মানুষ একদিন চলে যায়, কিন্তু তাদের রেখে যাওয়া আদর্শ, মূল্যবোধ এবং অবদান চিরকাল রয়ে যায়। আমি যখনই বেয়াইকে স্মরণ করি, আমার মনে পড়ে একজন সজ্জন, উদার ও চেতনার মানুষকে, যিনি নিজের কর্ম, বচন ও চিন্তায় ছিলেন উজ্জ্বল এক আলোকবর্তিকা। আমি আজও তাঁর হাসিমুখ, অমায়িক ব্যবহার এবং দেশের প্রতি ভালোবাসার কথা স্মরণ করি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সঙ্গে।

শেষকথা

জীবনে কিছু মানুষ থাকেন যারা সম্পর্কের বাইরেও আলো ছড়ান। রেদওয়ানুল হক তেমনই একজন মানুষ। তাঁর অবদান, তাঁর জীবনদর্শন এবং তাঁর হৃদয়ের প্রশস্ততা আজও আমাদের সকলের জন্য এক প্রেরণার উৎস। মহান আল্লাহ পাক যেন তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউসের সর্বোচ্চ স্থানে স্থান দেন—এই প্রার্থনা করি।

Our Dear Redwan Bhai Shaheb

Foruk Rabbani

My earliest memory of Redwan Bhai Shaheb goes back to around 1967, when he would often spend his evenings relaxing at home. As a child, I saw him as a calm, familiar figure whose presence brought a sense of comfort to our household.

In the years that followed, from 1968 to 1970, I frequently accompanied my father on visits to see Redwan Bhai Shaheb and Luman Bhai Shaheb at Tasker Street, Walsall, in the East Midlands. Although I was young, those visits made a lasting impression on me. There was always something special about the way Bhai Shaheb carried himself, with grace, quiet strength, and a deep sense of responsibility.

Bhai Shaheb played a vital and deeply influential role during the Liberation of Bangladesh. At a time when courage and conviction were most needed, he rose to the occasion without hesitation. He worked tirelessly, organising meetings, raising essential funds, and mobilising support for the War of Liberation. His commitment was not just symbolic; he contributed both physically and financially, standing firmly behind the movement for independence. Redwan Bhai Shaheb's dedication during this historic period reflected his deep love for his homeland and his unwavering sense of duty towards justice and freedom.

To us, the younger ones, Redwan Bhai Shaheb was firm and disciplined, yet never harsh. He treated us with

respect, like younger siblings he felt responsible for.

He had a natural gift for hospitality; he loved hosting guests, feeding people, and creating a warm, welcoming environment.

As a teenager, I often visited him at his restaurant, 'Sunar Bangla', on Hanbury Street in Tower Hamlets. He always treated me to a Sheek Kebab with onion salad and a cup of tea. These simple gestures meant a great deal to me.

It was in the basement of 'Sunar Bangla' that Jumu'ah (Friday) prayers were first held, long before the Brick Lane Masjid was established, a cause Bhai Shaheb was deeply committed to. He joined others, worked tirelessly, and played a vital role in acquiring the Brick Lane Masjid. His dedication to the community was unwavering. His commitment helped lay the foundation for what would become one of the most iconic and cherished mosques in the area.

By the early 1990s, Bhai Shaheb had relocated to Forest Gate, but his heart stayed with Brick Lane Masjid. He kept attending Taraweeh (fasting month) prayers there throughout Ramadan, and I had the honour of dropping him home on many nights. Those drives back were silent but meaningful. In those moments, I felt a bond of trust and deep mutual respect.

I remember him once telling me that he was my father's right-hand man in their youth, a loyal companion who stood by him like a shield. That loyalty didn't stop with my father; it extended to all of us. He was like an elder brother who stood over us like an umbrella, shielding us from harm and criticism, especially from those in our village. It was a silent form of love and protection, one I now recognise and cherish deeply.

Redwan Bhai Shaheb was not only kind-hearted and pious, but also a man who truly valued companionship. He loved to sit and talk, often recalling stories of the "good old days" with a smile in his eyes. To me, he will always be remembered as a gentle protector, a source of strength, and a respected elder. May Allah (SWT) shower His infinite mercy upon him, forgive his shortcomings, and grant him Jannatul Firdaus. Ameen.

পরিবার ও সমাজের একজন নির্ভরতার নাম

মো. গোলাম আহমদ শামীম

যাঁকে নিয়ে লিখছি তিনি আমার সম্পর্কে আপন বড়ো ভগ্নীপতি (মরহুম রেদওয়ানুল হক সাহেব)

কিন্তু তাঁকে কখনো সেরকম ভাবে দেখিনি। দেখেছি চাচাতো বড়ো ভাই হিসাবে। তিনি ছিলেন সামাজিক রাজনৈতিক এবং সালিশি ব্যক্তিত্ব। জীবিত থাকা অবস্থায় তিনি অনেক উন্নয়নমূলক কাজ বাংলাদেশে ও ইংল্যান্ডে করে গেছেন এবং দরিদ্র অসহায় মানুষদের সাহায্য করে গেছেন।

আমাদের বংশের ও আত্মীয়স্বজনদের যে-কোন বিপদ-আপদে সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন ।

তাঁর সাথে আমার অনেক স্মৃতি আছে যা বলে শেষ করার নয়।

আমি আমার বড়ো ভাইয়ের জন্য দুআ করি, আল্লাহ যেন তাঁকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করেন ।

আ-মিন

আমার চাচা

ছালেহা রহিম

আমার দাদার নাম মুহাম্মদ মাহফুজুল হক। আমার বাবা ও চাচারা চার ভাই এবং পাঁচ বোন ছিলেন। আমি তাঁদের বড়ো মেয়ে। বড়ো মেয়ে হিসেবে সবার কাছ থেকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা ও সম্মান পেয়েছি। আজ আমার বাবা, চাচা ও ফুফুরা কেউ আমাদের মাঝে নেই। আল্লাহ তাআলা তাঁদের জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করুন।

অনেক কথাই বলার আছে, কিন্তু এখানে তো সব বলা সম্ভব নয়। আজ আমি শুধু আমার মেজো চাচা সম্পর্কে কিছু কথা বলব। আমার চাচার নাম ছিল রেদওয়ানুল হক, ৩৫ বছর তিনি একটি দেওয়ানি মামলা চালিয়ে গেছেন। যা নিষ্পত্তি হতে ৫০ বছর সময় লেগেছে। এটা তাঁর ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে ছিল না। তিনি তাঁর পুরো বংশের পক্ষ থেকে একাই এই লড়াই করেছিলেন। দুই হাতে পানির মতো টাকা খরচ করেছিলেন এই মামলার পেছনে। তিনি জীবিতাবস্থায় মামলার রায় শুনে যান, আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু দখলদারিত্ব নিতে পারেননি। কারণ তাঁর কিছু আত্মীয় তাঁর বিরুদ্ধে আরেকটি মামলা দিয়ে বিষয়টিকে আরও জটিল করে তোলেছিলেন এবং তাঁকে দখল নিতে বাধা দিয়েছিলেন।

এই বিষয়টি নিয়ে তিনি সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন। সর্বোচ্চ আদালতের রায় পাওয়ার পরও শুধু নিজের আপনজনদের কারণে আরও অনেক বছর চাচাকে মামলা চালিয়ে যেতে হয়েছিল। চাচার মৃত্যুর পরও বিষয়টি বহু বছর ধরে চলেছে। চাচার মৃত্যুর পর আমার চাচাতো ভাই এমদাদুল হক টিপু বিষয়টির দায়িত্ব নেন। আমার ভাই চাচার অবর্তমানে আমাদের সকল বাদির পক্ষে দখলদারি বুঝে নেন।

আমার চাচা জীবিত থাকাকালীন সর্বক্ষণ এই মামলার পেছনেই লেগে ছিলেন। দুঃখের বিষয়, আমার বাবা ও চাচারা কেউ এই বিজয় দেখে যেতে পারেননি। টিপুর হাতে সবকিছুর একটা সুন্দর সমাধান হয়েছে; শুকুর আলহামদুলিল্লাহ। আমার চাচা ছিলেন একজন ধর্মপরায়ণ, দানশীল ও উদার মনের মানুষ।

মহান আল্লাহ তাআলা আমার বাবা-চাচাদের রূহের মাগফেরাত দান করুন। আ-মিন।

স্মৃতির আঙিনায় প্রিয় অভিভাবক চাচা রেদওয়ানুল হক

শাহনাজ আলেয়া, হাজেরা বেগম ও মুহিবুর রহমান (শহিদ)

জীবনের পথচলায় কিছু মানুষ থাকেন, যাঁরা রক্তের সম্পর্কের সীমা ছাড়িয়ে হৃদয়ের গভীরে বসবাস করেন। তাঁদের উপস্থিতি হয় সাহসের, আশ্রয়ের, ভালোবাসার প্রতিচ্ছবি। আমাদের প্রিয় চাচা, মরহুম রেদওয়ানুল হক ঠিক তেমনই একজন ব্যক্তি ছিলেন, যিনি শুধু আমাদের পরিবারের একজন সদস্য ছিলেন না, ছিলেন আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার শ্রীরামসি-দিঘিরপার গ্রামের এই মানুষটি ছিলেন আত্মিক শক্তির প্রতীক, দৃঢ়চেতা অথচ নম্র। একদিকে যেমন গ্রাম্য সালিশে ছিলেন অতুলনীয়, তেমনি পরিবারের ছোটো-বড়ো সকলের জন্য ছিলেন স্নেহময় অভিভাবক। ২০১০ সালের ২২ মার্চ তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন, কিন্তু রেখে যান অগণন স্মৃতি, শিক্ষা ও ভালোবাসার ছাপ।

চাচার স্বভাব ছিল বৈচিত্র্যময়। রাগি ছিলেন ঠিকই, তবে সে রাগ ছিল ক্ষণস্থায়ী। চোখে-মুখে যতই কঠোরতা থাকুক না কেন, অন্তরে তিনি ছিলেন তুলার মতো নরম। আমাদের বাবা শহিদ এখলাসুর রহমানের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল অনন্য। তাঁরা আপন ভাই না হলেও তাঁদের সম্পর্ক ছিল পরমাত্মীয়তার প্রতিচ্ছবি। একসাথে চলাফেরা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রবাসজীবনের প্রতিটি ধাপে তাঁরা একে-অপরের ছায়াসঙ্গী ছিলেন। লন্ডনের একই এলাকায় থেকেও তাঁরা দেশীয় মাটির সুগন্ধ ভুলে যাননি, ভুলে যাননি আত্মীয়পরিজনের টান।

চাচা ছিলেন দেশ ও মানুষের জন্য নিবেদিতপ্রাণ। প্রবাসজীবনে থেকেও দেশের প্রতি টান কখনো ম্লান হয়নি। তিনি দেশে ফিরলে গ্রামের

মানুষ যেন এক পথপ্রদর্শককে ফিরে পেত। তাঁর বিচক্ষণতা, ধৈর্য আর ন্যায়বোধ তাঁকে গ্রামের সালিশি মজলিসে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে তোলেছিল। অনেক সময় তাঁকে বলতে শুনেছি, 'সঠিক সিদ্ধান্ত নিলে কিছু লোক রাগ করবে ঠিকই, কিন্তু শেষমেষ শান্তি সেখানেই।'

১৯৭১ সালের ৩১ আগস্ট আমাদের পরিবারের ওপর নেমে আসে এক শোকাবহ ছায়া—পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে আমরা হারাই আমাদের পিতা শহিদ এখলাসুর রহমানকে। সেই চরম দুঃসময়ে চাচা এগিয়ে আসেন নিঃসংকোচে। তিনি হয়ে ওঠেন আমাদের মাথার ছায়া, আমাদের অভিভাবক, আমাদের দিশারি। আমরা—শাহনাজ আলেয়া, হাজেরা বেগম ও মুহিবুর রহমান (শহিদ)-তাঁর কাছে পেয়েছি পিতার মতো আদর, মায়ের মতো স্নেহ এবং অভিভাবকের মতো দায়িত্বশীলতা।

আমার (আলেয়ার) স্কুলজীবনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলোতে চাচা ছিলেন পাশে। এসএসসি পাসের পর তাঁর আনন্দ ছিল ঠিক যেন নিজের সন্তানের সফলতায় একজন পিতা যেমন হন, তেমনি। হাজেরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, চাচার উচ্ছ্বাসে যেন বাড়ির আঙিনা নতুন করে বেঁচে ওঠেছিল। আমি একবার চাচার একটি দলিল পড়েছিলাম, তখন চাচার আনন্দ ও গর্ববোধ ছিল কল্পনাতীত। আমার আমেরিকা যাওয়ার দিন তাঁর চোখে যে গর্ব আর ভালোবাসার ঝিলিক দেখেছিলাম, তা আজও হৃদয়ের কোণে অক্ষত রয়ে গেছে। শহিদ যখন লন্ডনে সরকারি চাকরিতে যোগ দেয়, চাচার গর্বিত কণ্ঠে আমরা প্রায়শই শুনতাম—'আমার ভাইয়ের ছেলে দেশের মুখ উজ্জ্বল করছে।' সেই গর্ব শুধু কথা নয়, ছিল আন্তরিকতা এবং ভালোবাসার প্রকাশ, ছিল এক যুদ্ধজয়ীর প্রশংসা।

চাচা কখনো কাউকে বোঝাতে যেতেন না যে, তিনি কতটা দায়িত্বশীল; কিন্তু তাঁর কাজ, অবস্থান ও উপস্থিতি দিয়েই তিনি তা প্রমাণ করতেন। আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী, এমনকি অচেনা মানুষের দুঃখ-দুর্দশায়ও তিনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। তাঁর জীবনের এই মানবিক দিকটি ছিল সবচেয়ে আলোকোজ্জ্বল। তিনি নিজের মতো চলতেন, কিন্তু জীবনের প্রতিটি সিদ্ধান্তে অন্যদের ভালোর কথা ভাবতেন। তিনি ছিলেন সেই মানুষ, যিনি নিজে কষ্ট করে হলেও অন্যের মুখে হাসি ফোটাতে পছন্দ করতেন। তাঁর মনে ক্ষুদ্রতা ছিল না, ছিল এক বিশাল হৃদয়। হয়তো এই কারণেই তিনি ছিলেন সকলের কাছে প্রিয়, সম্মানিত ও

শ্রদ্ধেয়। আজ আমরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছি, সমাজে মাথা উঁচু করে চলতে শিখেছি-এই পথচলার পেছনে চাচার অবদান ছিল নীরব, কিন্তু অমূল্য। তাঁর ছায়াতলে আমরা বেড়ে উঠেছি, তাঁর প্রেরণায় আমরা নিজেদের তৈরি করেছি।

চাচা নেই—এ কথা বলা সহজ, কিন্তু মানা কঠিন। কারণ তিনি আমাদের প্রতিটি স্মৃতিতে, আমাদের সফলতার প্রতিটি গল্পে, আমাদের হৃদয়ের প্রতিটি কোণে আজও জীবন্ত। আজ আমরা তাঁর জন্য শুধু একটাই দুআ করি—আল্লাহ যেন তাঁকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকামে আসীন করেন, তাঁর জীবনের প্রতিটি নেক আমল কবুল করেন।

চাচার এই শূন্যতা পূরণ হওয়ার নয়, তবে তাঁর রেখে যাওয়া স্মৃতি আমাদের শক্তি হয়ে পথ দেখাবে সারা জীবন।

আমার স্মৃতির পাতায়

হাফিজ মো. মতিউল হক

শাহজালালের পুণ্যভূমি সিলেট জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার অন্তর্গত ঐতিহ্যবাহী গ্রাম শ্রীরামসি। সুজলা-সুফলা শষ্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার, ছায়া সুনিবিড় গ্রামের অপূর্ব সৌন্দর্যে ঘেরা গ্রাম আমার জন্মস্থান। আমার আব্বার মামাতো ভাই এবং আমার চাচা মরহুম লন্ডন প্রবাসী রেদওয়ানুল হক। আমরা একই গ্রামের বাসিন্দা।

এ নশ্বর পৃথিবীতে যুগে যুগে আল্লাহর সৃষ্টির অপুর্ব কৌশলে মানব সৃষ্টির কল্যাণে কিছু কিছু মহৎপ্রাণ মানুষের আগমনে ঘটে। ওদের দ্বারা সমাজ আলোকিত হয় এবং কোনো না কোনোভাবে মানুষও উপকৃত হয়। ঠিক তেমনিভাবে আমার আব্বা আবদুল হকের মৃত্যুর পর পরই চাচা রেদওয়ানুল হকের প্রচেষ্টায় লেখাপড়ার সুযোগ পেয়ে আমি কৃতার্থ। আমার আব্বা ইন্তেকাল করেন ১৯৭৩ সালে। এর পর থেকেই চাচা আমার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁর নিজ কাঁধে তোলে নেন। চাচা মরহুম রেদওয়ানুল হক আমার দায়িত্বটি নিজ কাঁধে তোলে নিয়েছিলেন-তা আমার জন্মদাতা পিতার চেয়ে কম ছিল না। আর এজন্য আজ এপর্যন্ত এসেছি। আল্লাহ পাকের দরবারে লাখো শুকুর এবং তাঁর জন্য জান্নাতুল ফেরদৌস কামনা করি।

অতীত স্মৃতিচারণ যেমন মধুর, তেমনি বেদনাদায়কও বটে। ১৯৭৫ সালে সিলেটের মিরাবাজারে কিশোরী মোহন পাঠশালায় সমাপনী পরীক্ষা শেষ করে আমাদের গ্রামের দিঘিরপার মসজিদে আমার ওস্তাদজি হাফিজ মো. আব্দুস শহিদের তত্ত্বাবধানে কয়েক জন ছাত্র নিয়ে কুরআনে ‘নাজারা’ পড়া শুরু করি। পরে তাঁর তত্ত্বাবধানে হাফিজের পড়া শুরু হয়। কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আস্তে আস্তে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তাতে গ্রামের কিছু কুচক্রী মহলের ইন্ধনে আমার প্রাণপ্রিয় ওস্তাদজি হাফিজ আব্দুস

শহিদকে সরানোর চেষ্টা করা হয়। কোনো উপায়ান্তর না পেয়ে বেতনের ওপর আঘাত আসে। চাচা রেদওয়ানুল হক লন্ডন থেকে দেশে এলে ওস্তাদজির জন্য চাচার প্রসিদ্ধ বাংলোঘরে (বৈঠকখানা) আমাদের থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করেন। এরপর থেকেই শ্রীরামসি হাফিজিয়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী ওই মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে কৃতিত্বের সাথে দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে আছে। আদর্শ শ্রীরামসি গ্রামের মানুষের কৃতিত্ব আর আমার চাচা রেদওয়ানুল হকের সহযোগিতায় এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

চাচার বাংলোঘরটির সাথে আমার অনেক স্মৃতি। মনের মণিকোঠায় আজও দাগ কাটে বসে আছে সেই দিনগুলোর কথা। আমাদের শিক্ষকসহ অনেক ছাত্রের ওই বাংলোঘরেই খাওয়াদাওয়া ও থাকার সুব্যবস্থা ছিল। দিনে কিংবা রাতে অসংখ্য মানুষের পদচারণায় মুখরিত থাকত সেই ঘরটি। ১৯৯১ সালে আমি যখন লন্ডন আসি, তখন তাঁর সান্নিধ্যে ব্রিকলেন জামে মসজিদে ইমামতি করার সুযোগ হয়। তিনি মসজিদ কমিটির সহ-কোষাধ্যক্ষ হিসাবে দীর্ঘদিন যাবৎ নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন সাদামনের মানুষ। বাসস্থান ছিল হ্যানবারি স্ট্রিটে। ওখানেও গ্রামের এত অসংখ্য মানুষের পদচারণা। জ্ঞানীগুণীদের মিলনে গ্রাম তথা মসজিদের উন্নয়নে সর্বদা আলোচনা। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র, নম্র সদালাপী, খোলা মনের মানুষ। অতিথি আপ্যায়নেও ছিলেন অত্যন্ত সুদক্ষ। অদ্যাবধি আমার মরহুম চাচা সম্পর্কে কাউকে কোনো বাজে মন্তব্য করতে শুনিনি; বরং সবাই তাকে একজন মহৎ হৃদয়ের মানুষ হিসাবেই গণ্য করেন। আমার জন্মদাতা পিতাসহ সকলের জন্য রাব্বুল আ'লামিনের দরবারে করজোড়ে দুআ চাই। তাঁদের আত্মা যেন শান্তিতে থাকে। তিনি দুই ছেলে ও দুই মেয়ে রেখে গেছেন। তাঁদের সকলের দীর্ঘায়ু কামনা করি। তাঁদের আব্বার মতো তাঁদের ধৈর্য ও সহনশীলতায় আমরা মুগ্ধ।

পুত্রের স্মৃতিতে পিতা

এমদাদুল হক টিপু

শৈশবে তাঁর ডাকে আমি প্রথমবারের মতো আব্বুর কোলে বসে খাবার খাই সেই স্মৃতি এখনো আমার মনে জ্বলজ্বল করে। তখন আমার বয়স মাত্র সাড়ে তিন বছর। বেশিরভাগ সময় তিনি বিলেতে থাকতেন, তবে দেশে আসার সময় আমাদের মধ্যে এক ধরনের ভয় কাজ করত—তিনি যেন অসন্তুষ্ট না হন। আমরা অনেক যত্নে ও আদবকায়দায় থাকতাম, যাতে তাঁর সামনে কোনো ভুল না হয়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন, শৃঙ্খলাবান ও শিক্ষানুরাগী। আমাদের বাসার শিক্ষক হিসেবে তিনি পড়াশোনায় খুব গুরুত্ব দিতেন। তাঁর সময়ানুবর্তিতা ও নিয়মানুবর্তিতা ছিল অনুকরণীয়। আমার আব্বার সাথে আমার ছোটোবেলার স্মৃতি অল্প। আমার বয়স যখন সাড়ে তিন বছর, তখন আব্বা লন্ডন থেকে দেশে আসেন। আব্বা আমাদের লেখাপড়ার বিষয়ে খবুই যত্নবান ছিলেন। বাংলা-ইংরেজি পড়ার জন্য মাস্টার আর আরবি শিক্ষার জন্য হুজুর রেখে দিয়েছিলেন। যখন আমি ষষ্ঠ বা সপ্তম শ্রেণিতে পড়ি, তখন একজন প্রফেসর আমাকে পড়াতেন। বন্ধুরাও আমার কাছ থেকে নোট নিতেন। একদিন আইসক্রিম খাওয়ার ইচ্ছে হলে আম্মার কাছে টাকা চাই। আব্বা তা শুনে জিজ্ঞেস করেন টাকা দিয়ে কী করবে? ভয়ে ভয়ে বললাম আইসক্রিম খাব। তখন আব্বা বললেন, টাকা চাইতে নেই। কিছু খাবার ইচ্ছে হলে আমাকে বলবে। এর পর তিনি আমাদের জন্য অনেক আইসক্রিম কিনে আনেন। খাওয়ার জিনিস আমাদের জন্য কিনে আনতে কোনো কার্পণ্য করতেন না, বরং বেশিই কিনে আনতেন।

আব্বা ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। সব সময় সত্যের পক্ষে ছিলেন। এজন্য গ্রামের ছোটোবড়ো সবাই তাঁকে সমীহ করতেন। অমায়িক ব্যবহারের জন্য তাঁকে সবাই ভালোবাসতেন। তাঁর উদারতা ও

সাহসিকতা আমাদেরকে পথ চলায় সাহায্য করে। আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি তিনি ছিলেন বংশের আলো। বংশের সম্মান ধরে রাখায় ছিলেন অবিচল। বংশের মর্যাদা অটুট রাখতে অনেক অর্থ ও সময় ব্যয় করেছেন। এই বিষয়ে কোনো আপস করেননি। মহান আল্লার প্রতি তাঁর ছিল অগাধ বিশ্বাস। সত্যের পথে অটল থাকার কারণে মৃত্যুর পূর্বমূহূর্ত পর্যন্ত বংশমর্যাদা রক্ষায় ও নিজের একটি ভূসম্পত্তি রক্ষায় দেশের সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত লড়েছেন। দুঃখের বিষয়, সেই মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি তিনি দেখে যেতে না পারলেও মামলার ৫০ বছর পর আদালতের রায়ে ভূসম্পত্তির দখল সমঝে দেওয়া হয় বাদিগণের পক্ষে আমাদের কাছে। আব্বার স্মৃতি ও সেবামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে আমরা পারিবারিকভাবে গঠন করেছি: 'রুফিয়া-রেদওয়ান ট্রাস্ট'। ২০১০ সালে ট্রাস্ট গঠনের পর শুরু হয়েছে বিভিন্ন সেবামূলক কাজ। খুব নীরবে গ্রামে এবং আত্মীয়স্বজনদের সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে ট্রাস্ট। অচিরেই এই ট্রাস্টের পরিধি বাড়বে ইনশাআল্লাহ।

আব্বা পুথিগত বিদ্যায় তেমন অগ্রসর না থাকলেও প্রখর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি বুঝতেন তাঁর সীমাব্ধতার কথা। এই সুযোগে অনেকেই তাঁর কাছ থেকে নানা ফায়দা লুটছেন। তাই তিনি চাননি তাঁর সন্তানেরা যেন এমন অভিজ্ঞতা লাভ করুক। তখনকার সময় যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল চিঠি। টেলিফোন-টেলিগ্রাম ছিল। তবে সেগুলো ছিল প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের জন্য অনেকটা আকাশের চাঁদের মতো। না ধরা যেত, না ছোঁয়া যেত। মাস লেগে যেত চিঠি পেতে। তিনি আমাদের শাসন-সোহাগ যা-ই করেছেন-চিঠির মাধ্যমে। আমরাও সেভাবেই চলাফেরা করেছি। কিছু করতে হলে তাঁর অনুমতি নিতাম চিঠির মাধ্যমে। চিঠির অপেক্ষায় থাকতে হতো অনেকদিন। অবাধ্য হওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। মহৎপ্রাণ ছিলেন আব্বা। পুত্র হিসাবে আমি গর্ববোধ করি। আব্বা টাকা জমানোর চিন্তা করতেন না। মেহমানদারি যেন ছিল তাঁর রক্তের ধারা। সময়ে-অসময়ে বাড়িতে মেহমান আসা-যাওয়া ছিল অনেকটা স্বাভাবিক। খাওয়াদাওয়া হাসি-গল্পে মশগুল থাকতে পছন্দ করতেন আব্বা। বাজারের সেরা মাছ ও মাংস দিয়ে মেহমানদারি চলত। মাছ-মাংস বিক্রেতারা তাঁর জন্য অপেক্ষায় থাকতেন। অনেক সময় বিক্রেতারা মাছ-মাংস বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন। ছোটোকালে তাঁকে কঠোর

প্রকৃতির লোক হিসাবে দেখেছি। কিন্তু তাঁর কোমল হৃদয়ের ভাষা বুঝতে অনেক দেরি হয়ে যায়। রাতের আঁধারে জায়নামাজে অঝোরধারে কান্না আজও কানে বাজে। সেই কান্নার মর্ম তখন না বুঝলেও এখন সমগ্র সত্তাজুড়ে সেই অনুভূতি। হায়, সেই দিনটি কি আর ফিরে পাব। এখন হৃদয়জুড়ে সারাক্ষণ বাজে: 'রাব্বির হাম হুমা কামা রাব্বাইয়ানি সাগিরা।'

বয়স যখন বাড়তে থাকে তখন স্মৃতির আয়নায় অনেক ঘটনা জমা হতে থাকে। কিছু স্মৃতি অম্লান, কিছু ঝাপসা। আব্বার অসুস্থতার খবর পেয়ে বিলাত থেকে সিলেট চলে আসি। সিলেটের একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন আব্বার কাছে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে দেখে খুব খুশি হন। তখন তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন বাড়ি যাওয়ার। ক্লিনিক থেকে ছাড়পত্র নিয়ে আব্বাকে বাড়ি যেতে রওয়ানা হই। পথে বিশ্বনাথ বাজারে নেমে মাছ-মাংস, বিস্কুটসহ নানা রকমের বাজারসদাই করেন। বাড়িতে গিয়ে বলেন, ছেলে বিদেশ থেকে এসেছে। লোকজন আসবে, আপ্যায়ন করা লাগবে। স্থানীয় বাজারের মাছবিক্রেতাতের কাছে খবর পাঠান পোনা মাছ ও বিলের বড়ো রুই মাছের জন্য। অসুস্থ শরীর নিয়ে তিনি মেহমানদারিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আমার মনে হলো, তিনি যেন মেহমানদারির জন্য ক্লিনিক থেকে বাড়ি ফিরেছেন।

পরদিন ইমাম সাহেবেকে নিয়ে বাজারে যাচ্ছিলাম। পথে দেখি ভিড়। একজন মাছবিক্রেতা বিশাল দুটি বোয়াল মাছ নিয়ে বসে আছে। লোকজন দরদাম করতে চাইলেও বিক্রেতা সেটির দাম বলছেন না। একপর্যায়ে বিক্রেতা বলেন, এটি রেদওয়ান সাবের জন্য রাখা হয়েছে। ইমামের মাধ্যমে আমি মাছের দাম জনতে চাইলেও কাজ হয়নি। ইমাম আমাকে বললেন, এই মাছ আপনাদের বাড়িতেই যাবে। উল্লেখ্য, মাছবিক্রেতা আমাকে চেনেন না। এরকম অনেক ঘটনার স্মৃতি মনে পড়ে।

আমি যখন ছোটো, তখন আমার বয়স আনুমানিক ৬-৭ বছর। আব্বা আমাকে পড়াতেন। অন্যদের তুলনায় আমি একটু দুরন্ত ছিলাম। কিন্তু তিনি কখনো বিরক্ত হতেন না। ধৈর্য সহকারে শেখাতেন। তাঁর একাগ্রতা এবং আগ্রহ ছিল অতুলনীয়। তিনি আমার পড়াশোনা ও নৈতিক দিঙ্‌নির্দেশনায় এক অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। খাবার সময়ও তিনি খেয়াল রাখতেন কে কী খেল, কে খেল না। তাঁর উপস্থিতি আমাদের পরিবারে এক বিশেষ শৃঙ্খলা ও ভালোবাসার পরিবেশ তৈরি করেছিল। আমরা সবাই তাঁকে বেশ ভয় পেতাম। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল ভারী। কিন্তু

তিনি ছিলেন উদার হৃদয়ের মানুষ। শুধু আমরা নয়, তাঁর ভাইয়েরাও এবং গ্রামের অন্যরাও তাঁকে ভয় পেতেন। তবে সবাই তাঁকে সম্মান করতে দেখেছি। তিনি ন্যায়ের পক্ষে ছিলেন। সত্যের জন্য সর্বদা সাহসিকতার সাথে লড়ছেন। অন্যায় দেখলে চুপ না থেকে প্রতিবাদ করতেন। দেশে-বিদেশে সব জায়গাতেই তাঁর উদারতা ও সাহসিকতার গল্প আজও মানুষ স্মরণ করে।

তাঁর জন্ম হয়েছিল এমন এক বংশে, যে বংশ নাম, গৌরব ও অতিথিপরায়ণতা ধরে রেখেছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। আমি মনে করি, এই পার্থিব যুগে গ্রামে বহু মানুষ বসবাস করলেও তাঁর এত অতুলনীয় স্বাক্ষর খুব কম জনই রেখে গেছেন। তিনি কখনোই বংশের সুনাম বা মর্যাদাকে পেছনে ফেলে দেননি; বরং বংশের সম্মান বজায় রাখতে নিজের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়, শ্রম, অর্থ এবং মেধা ব্যয় করেছেন। তিনি ছিলেন এমন একজন, যিনি ন্যায়বিচারের প্রশ্নে সর্বোচ্চ আদালতে যাওয়ার সাহস রাখতেন। রাতবিরেতে যে কেউ তাঁর কাছে গেলে সাহায্য-সহযোগিতা করতে পিছপা হতেন না। তাঁর জাত্যাভিমান ছিল স্পষ্ট। তিনি মিরাশদার হিসেবে বংশের ঐতিহ্য রক্ষা করেছেন সর্বোচ্চ নিষ্ঠার সাথে। কাউকে তত্ত্বাবধায়ক বানিয়ে দায়িত্ব ছাড়েননি। তিনি নিজেই সবকিছু দেখভাল করতেন। ব্যক্তিগতভাবে অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যে আব্বার অনুপ্রেরণায় আমরা ভাই-বোন মিলে মানুষ হয়েছি। তিনি ছিলেন আমাদের পরিবারের 'রোল মডেল'। আমরা ভাইবোনসহ পরিবারের সদস্যরা মিলে ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠা করেছি রুফিয়া-রেদওয়ান ট্রাস্ট। তিনি মানুষের জন্য নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। কোনোদিন দেখিনি ভবিষ্যতের জন্য টাকা জমাতে। ভবিষ্যতের জন্য তাঁর কোনো পরিকল্পনা ছিল না। কীভাবে একজন বিপদগ্রস্তকে উজাড় করে সাহায্য করা যায়, সেজন্য যেন প্রস্তুত থাকতেন। মেহমানদারি খুবই পছন্দ করতেন। নিজেও ভোজনরসিক ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগেই তাঁর রেস্টুরেন্টর নাম রেখেছিলেন 'সোনার বাংলা'। যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলো, তখন এই রেস্টুরেন্টেই মুক্তিযুদ্ধের মিটিং হতো। ফান্ড রাইজিং হতো যুদ্ধের জন্য। ওই সময়ে দশ মাস তাঁর সাথে পরিবারের যোগাযোগ ছিল না। সব যোগাযোগ বন্ধ থাকায় আমার জন্মের খবর পান অনেক দিন পর। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী রেদওয়ানুল হকসহ গ্রামের অনেকের নামের তালিকা তৈরি

করেছিল। হানাদার বাহিনী আমাদের বাড়িসহ কয়েকটি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। গ্রামে মিটিংয়ের কথা বলে শ্রীরামসি স্কুলের সামনে নিয়ে বহু লোককে নির্মম ভাবে হত্যা করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। ইংল্যান্ডে তাঁর 'সোনার বাংলা' রেস্টুরেন্টে মুক্তিযুদ্ধের জন্য টাকা ওঠানো হতো। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে ফিরে রেদওয়ানুল হক দেখেন চারদিকে অভাব। এমনকি গ্রামে বিশুদ্ধ পানির অভাব। বিশুদ্ধ পানির অভাব দূর করতে তিনি তাঁর বাড়িতে দুটি চাপকল বসান। একটি নিজ পরিবারের জন্য, অপরটি ছিল বাংলোঘরের সামনে। যেখান থেকে মানুষ সহজে পানি নিতে পারতেন।

গ্রামবাসীর জন্য ভাবনা

আব্বা কখনো নিজের জন্য কিছু করার কথা ভবতেন না। মাথায় ভালো কিছু করার চিন্তা এলে প্রথমে নিজের স্বজনদের কথা ভাবতেন। গ্রামের অনগ্রসর লোকের কথা ভাবতেন। ঈদের বাজারসদাই নিজঘরে পৌঁছার আগে পৌঁছে দিতেন পিছিয়েপড়া লোকজনের বাড়িতে। ভীষণ জেদি এই মানুষটি ছিলেন এককথার মানুষ। কোনো রকম ধোঁকাবাজির সাথে তাঁর সম্পৃতা ছিল না। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কারণে এলাকার কিছু লোক তাঁকে হিংসা করত। নানাভাবে তাঁকে আটকানোর চেষ্টা হতো। এমনকি নানা মামলা দিয়েও আটকানোর ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, তাঁর কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে তাঁরই বিরুদ্ধে মামলা করার নজিরও রয়েছে। তবে তিনি কোনোদিন কাউকে মামলা দিয়ে হয়রানি করেননি। অসীম ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছেন। কাউকে পছন্দ হলে মন উজাড় করে বিলিয়ে দিতেন।

শ্বশুর থেকে বাবা এক হৃদয়ের যাত্রা

রুমেনা জমজম চৌধুরী

আমার জীবনে দু'জন পিতা ছিলেন। একজন আমার জন্মদাতা—আমার আব্বা। আর অন্যজন ছিলেন আমার শ্বশুর; যাকে আমি বাবা ডাকতাম। দুঃখের বিষয়, দুজনের কেউই এখন আর আমাদের মাঝে নেই। দুই বছরের ব্যবধানে দুজনই আমাদের ছেড়ে পরপারে পাড়ি জমান। মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, যেন আমাদের সকল আপনজন যাঁরা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন তাঁদেরকে বেহেশতের সুউচ্চ স্থান দান করেন। আ-মিন।

আমার আব্বা ছিলেন আমাদের সাথে বন্ধুর মতো, হাসিখুশি, সব সময় পরিবারকেন্দ্রিক থাকা, আমাদের সাথে নিয়ে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করা, কখনো তাঁর ফিরতে দেরি হলে আমরা অপেক্ষা করে ঘুমিয়ে গেলে তিনি এসে খাবার নিয়ে মশারির ভেতরে ঢুকে আমাদের খাইয়ে দিয়ে তারপরে নিজে খেতেন। এমনকি তিনি স্কুল থেকে বাড়ি এসে দুপুরের খাবার খেতেন (মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন) তাই আমাদেরও আসতে হতো একসাথে খাওয়ার জন্য। আর অন্যজন, যিনি শুরুতে একেবারেই ভিন্ন ছিলেন বাবা মানে আমার শ্বশুর।

বিয়ের পর যখন নতুন জীবনে পা দিলাম, বুঝতে পারলাম তিনি একজন রক্ষণশীল ও নিয়মানুবর্তী মানুষ। পরিবারের সদস্যদের তাঁর দূরত্ব অনেকটাই স্পষ্ট। সবার আগে একা একা খাওয়া, খুব বেশি আবেগ প্রকাশ না করা, সবার সঙ্গে যেন এক অদৃশ্য প্রাচীর। যার দুটি প্রধান কারণও ছিল ১; তিনি নিজে এভাবেই বড়ো হয়েছেন এবং ২; তাঁর জীবনের বেশিরভাগ সময় প্রবাসে কেটেছে একা এবং সন্তানদের বাল্যকালে তাঁর অনুপস্থিতি, যার ফলে তাদের মধ্যে সখ্য তৈরি হয়নি। তাঁদের পুরো পাড়ার লোকেরা সবাই নিকটাত্মীয় ছিলেন। কিন্তু আমি কখনোই দেখিনি বাবার সঙ্গে কাউকে তর্কে জড়াতে। তিনি যা-ই বলতেন

সবাই (অন্তত সামনে!) মেনে নিতেন। সংসারজীবনের প্রথম দিন শ্বশুরের সাথে আমার পরিচয়টা হয় আতঙ্কিত হয়ে। শ্বশুরবাড়িতে প্রথম দিন সকালে ঘুম ভাঙে তাঁর বজ্রকণ্ঠ শুনে। তখন আমার বর বললেন, এটাতো আব্বার স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ধীরে ধীরে অভ্যাস হয়ে যাবে হয়েছিলও তা-ই। প্রথমেই আমার চোখে পড়ল তাঁর নিয়মে বাঁধা জীবন আর নিজের মতকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা এক দৃঢ়জগৎ। আমি প্রায়ই মনে মনে ভাবতাম, কীভাবে একজন মানুষ এতটা রক্ষণশীল হতে পারেন। আর নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকতে পারেন? কারণ আমার দেখা পিতারা (আমার আব্বা ও চাচারা) ছিলেন বন্ধুর মতো এবং তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ছিল সর্বত্র। শুধু পরিবারের হর্তাকর্তা নন, বরং ছিলেন সকল কিছুর কেন্দ্রবিন্দু। বিকেলটা ছিল আমাদের পারিবারিক মিলনমেলা। সবাই একসঙ্গে বসে হাসি-ঠাট্টা করা, পুরো দিন কোথায় কী হলো সেসব কথা জানা। আব্বার কাছে আমাদের সাঁতার কাটতে শেখা, সকল প্রকার খেলাধুলা, কবিতা আবৃত্তি ও গল্প-কবিতা লেখা সবকিছুর হাতেখড়ি।

তাই প্রথম দিকে শ্বশুরের জীবনধারা আমার কাছে অবাস্তব মনে হতো এবং শ্বশুরবাড়ির পরিবেশটা শুরুতে আমার কাছে খুব অচেনা এবং কঠিন মনে হয়েছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে অনেক কিছু বদলাতে থাকে। ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত সখ্য গড়ে উঠতে লাগল। আমি আবিষ্কার করলাম বাবা আসলে কথা বলতে পছন্দ করেন-যদি কথার বিষয়বস্তু তাঁর পছন্দের হয়। তিনি নিজে থেকে পদক্ষেপ নেন না। কিন্তু কেউ এগিয়ে গেলে তাকে ফিরিয়ে দেন না। প্রথম কয়েকদিন আমি তাকে কিছুই সম্বোধন করিনি (ভয়ে দূরে থাকতাম) তারপর তিনি একদিন জিজ্ঞেস করলেন আমি তাকে কী ডাকতে চাই? যখন আমি বললাম বাবা। তিনি খুব খুশি হলেন এবং বললেন তাঁর শখ ছিল যে সন্তানরা তাঁকে বাবা ডাকবে। কিন্তু তারা তাঁকে 'আব্বা' ডাকত। তিনি বললেন 'বাবা' একটা ছোটো ডাক, অথচ বিশাল অনুভবের প্রতীক। তাঁদের সময় এসব (সম্বোধন) খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এর মধ্যে একটা আবেগ ছিল, মায়া ছিল ইত্যাদি। তারপর শুধু এই বিষয়টি নিয়ে অনেক লম্বা আলোচনা হলো। বাবা বললেন, আমি শিক্ষিত পরিবারের মানুষ এবং আমার বাবা-মা আমাকে সঠিক শিক্ষা দিয়েছেন সেজন্য আমি এটা বুঝতে পেরেছি কী ডাকা উচিত। কিন্তু তাঁর সন্তানেরা সঠিক শিক্ষা পায়নি এবং ওরা নিজেকে বেশি আধুনিক জাহির করার জন্য বাবা-মা না ডেকে আব্বা-আম্মা ডাকে

(তিনি এতটাই খুশি ছিলেন যে ভুলেই গেছেন—আমি নিজে আমার মা-বাবাকে আম্মা-আব্বা ডাকি)। এরপর থেকে বাবা আমাকে ডেকে নিয়ে গল্প করতেন। তাঁর খাবার দিতে গেলে বলতেন তুমিও বসে পড়ো। তোমার শাশুড়ি দেখবেন আমাদের কিছু লাগবে কি না। তিনি পছন্দ করতেন পুরানো দিনের মতো পুরুষেরা খেতে বসলে ঘরের মেয়েলোকেরা খেয়াল রাখবে কিছু দরকার কি না। পাখা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে বাতাস করবেন গরমের দিনে, সেজন্য মা-কে (আমার শাশুড়িকে) একসাথে খাওয়ার জন্য ডাকতেন না। তবে ধীরে ধীরে এসবেরও পরিবর্তন এসেছিল, যখন বাবা-মা ইংল্যান্ডে এসে থাকতে শুরু করেন। তখন আমি বলতাম, আমি খেয়াল রাখব আপনারা দু'জনে একসাথে খেয়ে নেন। কারণ আপনাদের দু'জনেরই ওষুধ খাওয়া লাগবে। তখন থেকে মা-বাবা ধীরে ধীরে একসাথে খেতে অভ্যস্ত হয়ে যান।

ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেওয়ার পর থেকে বাবা খুব একটা সময় ইংল্যান্ডে থাকতে চাইতেন না, বলতেন আমি থাকলে তোমাদের অসুবিধা হবে, কারণ আমার জীবনধারা তোমাদের চেয়ে ভিন্ন। তিনি এসে দুই-তিন মাস পর চলে যেতেন। আমরা ভাগ্যবান ছিলাম যে, জীবনের শেষ আড়াই বছর বাবা আমাদের সাথে ছিলেন। কারণ চিকিৎসকেরা তাঁর ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলেন। বাবা আমাকে খবরের কাগজ পড়ে শোনাতে বলতেন। তাঁর রাজনৈতিক দলের (তিনি ছিলেন জাতীয় জনতা পার্টির আন্তর্জাতিক সংগঠক) বিষয়ে কথা বলতেন, চলমান মামলামোকদ্দমার বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। মামলার নথি পড়ে শোনাতে বলতেন, অনেক লম্বা সময় ধরে পড়তে হতো বলে আমি মাঝেমধ্যে কিছু বাদ দিয়ে দিতাম। কিন্তু বাবা বলতেন, বোধহয় একসাথে কিছু পাতা উলটে গেছে, তুমি খেয়াল করোনি। তাঁর এতটাই মনে গেঁথে ছিল এই বিষয়গুলো।

বাবা ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশের হাইকার্টে ১৪ দফা দাবি উত্থাপন করে একটি রিট পিটিশন (রিট পিটিশন ২৪৮৬) দায়ের করেন। এই রিটটি প্রবাসে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের পক্ষে দায়ের করা হয়। এতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, প্রবাসী বাংলাদেশিদের যেন ভোটাধিকার নিশ্চিত করা হয়, প্রবাসে মৃত্যুবরণ করলে তাদের মরদেহ যেন বিনা খরচে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয়, বাংলাদেশে তাদের সম্পত্তির সুরক্ষা নিশ্চিত করা হোক, সুরত মিয়া হত্যাকাণ্ডের যথাযথ বিচার নিশ্চিত করা

হোক, বিদেশফেরত যাত্রীদের জন্য বিমানবন্দর যেন হয় হয়রানিমুক্ত, প্রত্যেক জেলার সরকারি খাসজমি সেই জেলার ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করা হোক ইত্যাদি। আমি তাঁর সংগ্রহে থাকা সেই সময়ের খবরের কাগজের কাটিং পড়ে এসবের বিস্তারিত জানতে পেরেছি। বাবা তাঁদের পারিবারিক গল্প করতেন। তাঁদের ছোটোবেলার কথা বলতেন কীভাবে অবস্থাশালী গৃহস্থ পরিবার থেকে পিতৃবিয়োগের পর রাতারাতি দরিদ্রতার মুখোমুখি হন আপনজনদের ধূর্ততার কারণে। অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে যখন তিনি বিত্তশালী হয়ে ওঠেন, তখন পুরো এলাকার জন্য এমনকি যারা তাঁদের কষ্ট দিয়েছিল তাদের জন্যও অনেক কিছু করেছিলেন। পড়াশোনার খরচ, বিবাহযোগ্য আত্মীয়াদের বিয়ের ব্যবস্থা করাসহ বিবাহপরবর্তী সকল আচার-অনুষ্ঠান পালন করা, অসুস্থদের জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং কারো বিদেশ যাওয়ার ব্যবস্থা করা, কাজের ব্যবস্থা করা (নিজের দুই রেস্টুরেন্টে—সিলেটে এবং ইংল্যান্ডে) ইত্যাদি। আমি নিজে দেখেছি, বাবা যখন মামলার কাজে আদালতে যেতেন তখন মাঝেমধ্যে একই গাড়িতে তাঁর প্রতিপক্ষের লোককে (পাশের বাড়ির পড়শি) নিয়ে যেতেন। প্রায় সময় সেই প্রতিপক্ষকে বাবার সাথে কথা বলতে এবং খেতে দেখতাম। একদিন আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, আপনাদের যদি এত ভালো সম্পর্ক তাহলে এই মামলামোকদ্দমা কেন? বাবা বললেন, মামলাটা হচ্ছে আমাদের পরিচয়ের লড়াই-কোনো ঝগড়া নয়। তাই বলে প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক তো নষ্ট করা ঠিক নয়। একই মামলার শুনানিতে যাচ্ছি—আমি তো জানি, ওর কাছে টাকা নেই যাবে কীভাবে? এই মামলাই ওদের সর্বস্বান্ত করেছে। অনেক সময় বিবাদীর উকিলকে দেওয়ার জন্য কিছু টাকা হাতে দিয়ে দিতেন।

ঈদের আগে দেখেছি এলাকার যারা অবস্থাসম্পন্ন নয় তাদের ঘরে গুড়-ময়দা, সেমাইসহ তেল-পেঁয়াজ এসব পাঠিয়ে দিয়ে পরে নিজের ঘরে বাজার নিয়ে ফিরতেন। তিনি খুব সহজে মানুষকে বিশ্বাস করতেন, বেহিসেব ধার দিতেন এবং কখনো নিজ থেকে ফেরত চাইতেন না। বাবা ছিলেন একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক; যে কারণে ৫০ বছরের অধিক সময় বিলেতে থাকার পরও ব্রিটিশ পাসপোর্ট করেননি এবং সন্তানদের বিলেতে কোনো স্থাবর সম্পত্তি করতে দেননি। বাবা বলতেন, যা কিছু করতে চাও নিজের দেশে করো, যাতে শেকড়ের সাথে যোগাযোগ থাকে। নিজে ভোগ না করলেও নিজের দেশের মানুষ তো ভোগ করবে। বাংলাদেশের

স্বাধীনতার পূর্বেই তিনি ইংল্যান্ডে তাঁর রেস্টুরেন্টের নাম দিয়েছিলেন 'সোনার বাংলা', যেখানে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে বৈঠক করা হতো, পরবর্তী কর্মসূচি নির্ধারণ করা হতো, তহবিল সংগ্রহ করা হতো। এ কারণে তিনিসহ আরও কয়েকজনের খোঁজে তাঁদের শ্রীরামসি গ্রামে হানাদার বাহিনী হামলা করে অনেক মানুষকে হত্যা করে, বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়। তবুও তিনি দমে যাননি, সেই অগ্নিঝরা সময়ে নিজের প্রথম সন্তানের ভূমিষ্ঠ হওয়ার খবরও পেয়েছিলেন অনেক দেরিতে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি একই নামে সিলেটেও আরেকটি রেস্টুরেন্ট খোলেন এবং দীর্ঘদিন সুনামের সাথে ব্যবসা পরিচালনা করেছেন। ব্রিকলেন মসজিদের সাথে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাবা জড়িত ছিলেন। মসজিদ নির্মাণের সময় অনেক দিন পর্যন্ত তিনি তাঁর রেস্তোরাঁর রান্নাঘরে অস্থায়ী নামাজের ব্যবস্থা করে ছিলেন। এমনকি মসজিদের কাজ হাতে নেওয়ার আগে থেকেই জুমুআর নামাজ তাঁর রেস্তোরাঁর রান্নাঘরে হতো। আমি বাবার কাছ থেকে যতটুকু শুনেছি, তিনি ছিলেন মসজিদ কমিটির অ্যাসিসটেন্ট ট্রেজারার. তিনি বংলাদেশ সেন্টার, বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এবং আরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন।

তিনি গল্প করতেন তাঁদের সময় ইংল্যান্ডের জীবনযাপন কেমন ছিল, ইংরেজি না জানা সত্ত্বেও তারা কীভাবে চলাফেরা করতেন, কীভাবে শারীরিক অঙ্গভঙ্গি-হাতের ইশারা ও দুই একটা ভাঙা ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে বাজারসওদা করতেন, রাস্তাঘাট না চেনে কত প্রতিকূলতা কাটিয়ে কাজের শেষে ঘরে ফিরে আসতেন। তখন তুষারপাত খুব বেশি হতো এবং তাঁদের সে-অনুযায়ী মোটা কাপড় না থাকায় অনেক কষ্ট হতো। সে সময় শরীর গরম রাখতে কী পদ্ধতি অবলম্বন করতেন, কীভাবে একের অধিক মোজা পরে থাকতেন, এক ঘরে গাদাগাদি করে কীভাবে অনেক লোক থাকতেন, কেউ রাতে কাজে যেতেন আবার কেউ দিনে—তো সেভাবে পালা করে সবাই ঘুমাতেন—এসব গল্প করতেন। তখন অধিকাংশ মানুষ বিলেতে পরিবার আনতেন না। তাই সব পুরুষলোক টাকা সাশ্রয়ের জন্য এক ঘরে গাদাগাদি করে থাকতেন। নিয়মকানুন না জানায় এবং ভাষা না জানার কারণে social housing সম্পর্কে তাঁরা কিছুই জানতে পারেননি। তাই এই সুবিধা নিতে পারেননি, সরকারি অনেক ঘর খালি পড়ে থাকলেও তাঁরা ভাড়া ভাগাভাগি করে থাকতেন। তখন বর্ণবাদী আক্রমণ অনেক বেশি হতো। সেজন্য দলে বেঁধে কাজে

যেতেন এবং ঘরে ফিরতেন। হোয়াইটচ্যাপলে বর্ণবাদের শিকার হয়ে যিনি শহিদ হয়েছিলেন 'আলতাব আলী' তাঁর ব্যাপারে এবং সেদিনের সম্পূর্ণ ঘটনা কীভাবে ঘটেছিল সেই সম্পর্কে আমি বাবার কাছ থেকে জানতে পারি। বাবা গল্প করেছেন যে, এত প্রতিকূলতার মধ্যে তাঁরা আবার অনেক দুষ্টুমিও করতেন। যেমন—কেউ কাজে যাওয়ার সময় ঘরের বাইরে কোনো চিহ্ন রেখে যেতেন, যাতে কাজ থেকে ফিরে সহজে ঘর খুঁজে পান। তখন তঁদের কেউ দেখে ফেললে এটা সরিয়ে নিয়ে অন্য কোনো ঘরের সামনে রেখে দিতেন। তারপর অপেক্ষা করতেন ওই লোক ফিরে এসে কীভাবে ঘর খুঁজে বের করতে পারে সেটা দেখার জন্য। আবার কীভাবে কখনো একজনের রান্না করা কোনো মজার খাবার অন্যজন লুকিয়ে খেয়ে নিতেন ইত্যাদি।

তিনি ছিলেন ভোজনরসিক মানুষ। প্রতিদিনের দু'বেলার খাবারেই চাইতেন নতুন রান্না। বাইরে থেকে ফিরলে সবসময় হাতে বাজার থাকত, আর প্রায়ই কোনো মেহমান সঙ্গে করে আনতেন। তারপর বলে দিতেন নতুন আনা বাজার দিয়ে কী কী রান্না হবে এবং এটা দিয়ে খাইয়ে তারপর মেহমান বিদায় দিতেন। মাঝে মাঝে নিজেই রান্নাঘরে ঢুকে যেতেন। তাঁর মাংস রান্না ছিল অনবদ্য। তিনি ঘি দিয়ে মাংস রান্না করতেন এবং আমাদেরকেও বলতেন খাওয়ার জন্য। বাবা বলতেন, এটা ক্ষতিকারক নয়, তেলের রান্না এর চেয়ে বেশি ক্ষতিকারক। কারণ তিনি বুঝতে পারতেন তাঁর মতো ডুবন্ত ঘিয়ে রান্না খাওয়া আমাদের পছন্দ নয়। বাবা আমাকে শিখিয়েছেন ছুরি দিয়ে কাটাকুটির কৌশল। আমি রান্না সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। তখন বাবা দেখিয়েছেন কীভাবে সকল রান্নার মশলা একসঙ্গে প্রস্তুত করা যায় (রেস্টুরেন্টের পদ্ধতি)। তিনি শুধুই সাদা কাপড় পরতেন এবং খাওয়ার সময় পুরো কাপড় জুড়ে মশলার দাগ পড়ে যেত। তখন কিছুটা অপরাধীর মতো করে বলতেন আহা! নষ্ট করে ফেললাম! আচ্ছা এটা তাড়াতাড়ি ভিজিয়ে রাখলে সমস্যা হবে না, দাগ ওঠে যাবে। ধীরে ধীরে আমি উপলব্ধি করতে পারি, এই মানুষটি আর শুধুই আমার শ্বশুর নন। আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম, একসময় যে মানুষটা ছিলেন আমার কাছে অনেকটা রহস্যময়, আজ তিনি আমায় নিজের জগতে নিয়ে নিচ্ছেন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিমায়, কিছুটা আমার আব্বার ছায়া হয়ে। তিনি আমার আরেকজন বাবা। ওপারে ভালো থাকুন সকল পিতা।

রেদওয়ানুল হক দাদা ছিলেন এক অনন্য মানুষ

আলেয়া বেগম

আমার নাম আলেয়া বেগম। জন্ম বাংলাদেশের এক শান্ত, সুন্দর রসুলপুরে। আমার বাবার নাম রইসুল্লাহ। তিনি ছিলেন শ্রীরামসি বাজারের একজন প্রখ্যাত ব্যবসায়ী। তাঁর বড়ো মুদি দোকানটি 'রইসুল্লার দোকান' নামে এলাকায় ব্যাপক পরিচিত ছিল। আশপাশের বহু গ্রামের মানুষ আমাদের দোকানে বাজারসওদা করতে আসতেন। বাবার সুনাম, সততা ও ব্যবস্থাপনার কারণে তিনিও এলাকার সবার কাছে পরিচিত ছিলেন। এই সামাজিক অবস্থান আমাদের আরও কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল শ্রীরামসি গ্রামের কিছু বাসিন্দার সঙ্গে।

শ্রীরামসি গ্রামের এক স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন মরহুম রেদওয়ানুল হক, আমি তাঁকে দাদা বলে সম্বোধন করতাম। আমাদের বাড়ি থেকে দাদার বাড়ি হাঁটাপথে মাত্র পাঁচ মিনিট দূরত্বের। সেই সময়কার সম্পর্কের গভীরতা, আন্তরিকতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ আজকের দিনে খুব কমই দেখা যায়। আমার বাবা ও চাচাদের সঙ্গে দাদার ছিল অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, ছিল একধরনের হৃদ্যতা ও আত্মার সম্পর্ক। আমি দাদার বাড়ির পাশের মসজিদে আরবি শিখেছি। সেই ছোটোবেলার সকালবেলা কুরআন শিক্ষার সময়গুলো আজও মনের মধ্যে স্পষ্ট। পাশাপাশি আমি শ্রীরামসি গ্রামের স্থানীয় স্কুলেও পড়াশোনা করেছি। দাদার অনুপ্রেরণা-উৎসাহ আর উপস্থিতি ছিল সবসময় আশীর্বাদস্বরূপ।

দাদা রেদওয়ানুল হক ছিলেন এক সহজ-সরল, বিনয়ী, হৃদয়বান ও অত্যন্ত বন্ধুবৎসল মানুষ। তিনি কখনো কাউকে না বলতেন না। কারো বিপদে-আপদে তিনিই আগে এগিয়ে যেতেন। গ্রামের মানুষের জন্য তাঁর ভালোবাসা ছিল নিঃস্বার্থ। সেই সময়, যখন মানুষ একে-অপরের ওপর নির্ভর করত, দাদার মতো মানুষের উপস্থিতি ছিল এক আশীর্বাদ। তিনি ছিলেন সত্যিকারের 'মানবদরদি'। তাঁর মন ছিল দরাজ, হাসিমুখে সবার

পাশে দাঁড়াতেন। গ্রামের মানুষদের দুঃখ-দুর্দশায় তিনি ছিলেন আশার বাতিঘর। গরিব-দুঃখীর জন্য তাঁর হৃদয়ে ছিল অগাধ মমতা।

পরবর্তীকালে আমরা পরিবারসহ ইংল্যান্ডে চলে আসি। তখন আমাদের সম্পর্ক আরও গভীর হয়ে ওঠে। এই বিদেশবিভুঁইয়ে এসে দাদার স্নেহ ও সাহচার্য আমাদের এই নতুন দেশে মানিয়ে নিতে সাহায্য করেছিল। এখানেও আমরা পড়শি ছিলাম। এখানে দাদা ছিলেন পরামর্শদাতা, বন্ধু, অভিভাবক, এককথায় সবকিছুর মিশ্রণ। কঠিন সময়ে দাদার সাহচার্য আমাদের অনেক সাহস দিত।

ইংল্যান্ডে দাদার একটি রেস্টুরেন্ট ছিল হ্যানবারি স্ট্রিটে—'সোনার বাংলা' নামে। সেটি শুধু একটি রেস্টুরেন্ট ছিল না, ছিল এক প্রবাসী বাঙালির উষ্ণতা। আমরা প্রায়ই সেখানে খেতে যেতাম। দাদার আতিথেয়তা ছিল অতুলনীয়। তিনি যেভাবে সবাইকে আপন করে নিতেন, তা আজকাল খুব কম দেখা যায়। অতিথির মুখে হাসি ফোটানো যেন তাঁর জীবনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। আমার বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজনও হয়েছিল এই 'সোনার বাংলা' রেস্টুরেন্টে। সেই দিনটি আমার জীবনের অন্যতম স্মরণীয় দিন। আর দাদার উপস্থিতি, উৎসাহ ও সহযোগিতা সেই আনন্দ শতগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল।

ইংল্যান্ডে থাকাকালীন আমরা একে-অপরের পরম আপন হয়ে ওঠেছিলাম। কঠিন সময়ে, সুখ-দুঃখে রেদওয়ানুল হক দাদা ছিলেন আমাদের আপনজন। তাঁর আন্তরিকতা, ভালোবাসা ও জীবনবোধ আজও আমার হৃদয়ে গাঁথা।

আজ দাদা এবং আমার আব্বা আমাদের মাঝে নেই। তাঁদের অনুপস্থিতি আমাদের পরিবারের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। তবে তাঁরা আমাদের হৃদয়ে, আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনায় বেঁচে আছেন। আমি সবসময় তাঁদের রূহের মাগফিরাত কামনা করি। আল্লাহ যেন তাঁদেরকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন।

শেষকথা

মানুষ চলে যায়, কিন্তু রেখে যায় কিছু স্মৃতি। কিছু অনুভূতি। কিছু কাজের ছাপ। রেদওয়ানুল হক দাদা এমনই একজন মানুষ ছিলেন, যিনি শুধু প্রতিবেশী ছিলেন না; ছিলেন আমাদের হৃদয়ের মানুষ। তাঁর মানবিকতা, ভালোবাসা আর সহানুভূতির কথা স্মরণ করলেই চোখ ভিজে আসে। এই লেখাটি আমি দাদার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে রেখে গেলাম। তিনি ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন আমাদের হৃদয়ের গভীরে।

স্মৃতিচারণ : আলহাজ মোহাম্মদ রেদওয়ানুল হক

কবির আহমদ

আমার শ্বশুর আলহাজ মোহাম্মদ রেদওয়ানুল হক একজন অসাধারণ মানুষ ছিলেন। যাঁর স্মৃতি আজও আমাদের হৃদয়ে গভীরভাবে বেঁচে আছে। তিনি ২০১০ সালের ২২ মার্চ আমাদের ছেড়ে পরপারে পাড়ি জমান। কিন্তু তাঁর ভালোবাসা, আন্তরিকতা এবং মানুষের প্রতি উদার ব্যবহার আজও আমাদের জীবনে আলো হয়ে জ্বলছে। আমার বিয়ে হয় ২০০০ সালের ২৭ আগস্ট। সেই থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত এই দশটি বছরই ছিল তাঁর সরাসরি সান্নিধ্যে কাটানো আমার জীবনের এক অমূল্য সময়। মাত্র ১০ বছরের পরিচয়, কিন্তু যেন এক যুগের ভালোবাসা ও অভিভাবকত্ব।

বিয়ের পর থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক গড়ে ওঠেছিল, তা ছিল ভালোবাসা, সম্মান আর হৃদ্যতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন এবং পরিবারের সবাইকে খুব আপন করে নিতেন। তাঁর একটি মজার শখ ছিল। প্রতিবারই বাজার থেকে সবচেয়ে বড়ো এবং সুন্দর মাছ নিয়ে আসা। তিনি এসে হাসিমুখে আমার আম্মাকে বলতেন, 'বিয়াইন, মাছগুলো দেখে খুব সুন্দর লাগি গেল, তাই নিয়ে আসলাম, তাড়াতাড়ি রান্না করুন।' এসব ছোটো ছোটো আনন্দে তিনি তৃপ্তি পেতেন।

যখনই আমরা শ্বশুরবাড়িতে যেতাম, তিনি খুব খুশি হতেন এবং খাওয়াদাওয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন—কী খাওয়াবেন, কীভাবে খাওয়াবেন, সেই চিন্তায় সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতেন। আমরা খাওয়ার টেবিলে বসামাত্রই তিনি নিজ হাতে আমার প্লেটে হাঁসের মাংস, বড়ো মাছের মাথা তোলে দিতেন পরম মমতায়। তিনি নিজে খাওয়ানোর মাঝে আনন্দ খুঁজে পেতেন।

আমার বাড়ি সিলেট শহরের শাহপরান এলাকার খাদিমপাড়ায়, ১ নম্বর রোডে। বিয়ের আগেই আব্বার (আমার শ্বশুর) এই এলাকায় যাতায়াত ছিল এবং এখানেই তাঁর জমি-জায়গাও ছিল। তাই এলাকার মানুষজন তাঁকে ভালো করেই চিনত ও শ্রদ্ধা করত। বিয়ের পর দেখতাম, তিনি যখন শাহপরান বাজারে যেতেন-তখন মানুষজন তাঁকে ঘিরে ধরত, সালাম জানাত, গল্প করত। তিনি মানুষকে ভীষণ ভালোবাসতেন, বিশেষ করে গরিব-দুঃখীদের প্রতি ছিলেন উদার হৃদয়ের একজন প্রকৃত সহানুভূতিশীল মানুষ। যেখানেই যেতেন, সবাইকে চা-নাশতা খাওয়াতেন। খোঁজখবর নিতেন। এইগুলো তাঁর স্বভাবসুলভ অভ্যাস ছিল।

২০০২ সালে আমি লন্ডনে আসি। লন্ডনে আসার পরেও তিনি সবসময় আমাকে নানা বিষয়ে সাহায্য, পরামর্শ ও উপদেশ দিতেন। তিনি বেশিরভাগ সময়ই দেশে থাকতেন, তবে মাঝে মাঝে লন্ডনে আসতেন। তখনো তিনি একইভাবে আমার খোঁজখবর রাখতেন। পরিবারের প্রতি তাঁর দায়িত্ববোধ ছিল অত্যন্ত প্রখর। ২০০৩ সালে আমার একমাত্র ছেলে মিহাদ-এর জন্ম হয়। নাতির প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অতুলনীয়। তিনি মিহাদকে খুব আদর করতেন, কোলে নিতেন, খেলা করতেন। তাঁর চোখেমুখে ছিল এক অদ্ভুত প্রশান্তি-যখন তিনি নাতির পাশে থাকতেন। এই সম্পর্কটাও ছিল হৃদয়ের খুব গভীর জায়গা থেকে গড়ে ওঠা।

আজ তিনি আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তাঁর ভালোবাসা, শিক্ষা ও আদর্শ আমাদের হৃদয়ে চিরকাল বেঁচে থাকবে। হে মহান আল্লাহ তায়ালা, আপনি আমার আব্বাকে (শ্বশুরকে) জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা এবং জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন এই দুআ করি। আ-মিন, সুম্মা আ-মিন।

স্মৃতির স্মরণে

মুহাম্মদ লুৎফর রহমান শিকদার

আপনাকে নিয়ে গর্ববোধ করি শ্রদ্ধেয় চাচাশ্বশুর মরহুম রেদওয়ানুল হক। আজও যেন বিশ্বাস হয় না, আপনি আর আমাদের মাঝে নেই। আপনার স্মৃতি, ভালোবাসা, আর সহানুভূতির ছায়া আমাদের হৃদয়ে চিরদিন অম্লান থাকবে। আপনি ছিলেন একজন সৎ, নির্লোভ ও দয়ালু মানুষ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনি আমাদের অনুপ্রেরণা হয়ে আছেন।

আপনার মমতা ও সাহচর্য আজও আমাদের হৃদয়কে নাড়া দেয়। আপনার সাথে কাটানো মুহূর্তগুলো আজ শুধুই স্মৃতি, কিন্তু সেই স্মৃতিগুলোই আমাদের বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা।

আপনার অভাব কখনো পূরণ হওয়ার নয়। আমরা আপনার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। আল্লাহ তায়া'লা আপনাকে জান্নাতের সুউচ্চ মাকাম দান করুক। আ-মিন। 'ভালোবাসা কখনো মরে না, ভালো মানুষ কখনো ভুলে যায় না।'

একজন দানশীল ব্যক্তির স্মৃতিচারণ

অলিউর রহমান চাঁন মিয়া

এই ধরাতে এমন কিছু মানুষ রয়েছেন যারা তাঁদের কাজকর্ম, আচার-ব্যবহারের দ্বারা যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকেন। তাঁদের মহৎ গুণাবলির কারণে মানুষ তাঁদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে এবং তাঁরা মরেও অমর হয়ে থাকেন। এমনই একজন গুণাবলিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন মরহুম জননেতা হাজি রেদওয়ানুল হক। তিনি হচ্ছেন আমার শ্রদ্ধেয় চাচা। তাঁর সম্পর্কে যতই লিখি না কেন সেটা কম হবে। তথাপি তাঁর সম্পর্কে দুএকটি উল্লেখযোগ্য স্মৃতিচারণ তোলে ধরার চেষ্টা করছি।

স্মৃতিচারণ : ১

মরহুম জননেতা হাজি রেদওয়ানুল হক চাচা ছিলেন একজন ধর্মপরায়ণ ও ইসলামি চিন্তাধারার মানুষ। ইসলামি জ্ঞান-দ্বিনি শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে তিনি নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ছিল ঐতিহ্যবাহী শ্রীরামসি হাফিজিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা। তিনি যখন শ্রীরামসি গ্রামে একটি দ্বিনি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন, তখন তিনি নিজ বাড়িতেই একটি হাফিজিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে ছাত্ররা আল্লাহর কালাম কুরআনুল কারিম আলহাজ হাফিজ আব্দুস শহিদের নিকট মুখস্থ করা শুরু করে। এভাবে দীর্ঘদিন তাঁর বাড়িতেই কুরআনুল কারিম হিফজ বা মুখস্থকরণ চলতে থাকে। এই জায়গা থেকেই পরবর্তীকালে বর্তমান ঐতিহ্যবাহী শ্রীরামসি হাফিজিয়া ইবতেদায়ি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজেই ঐতিহ্যবাহী শ্রীরামসি হাফিজিয়া মাদ্রাসার মূল প্রতিষ্ঠাতা ও রূপকার ছিলেন আমার শ্রদ্ধেয় চাচা মরহুম জননেতা রেদওয়ানুল হক। আমি আশা করি, তাঁর নাজাতের জন্য এই দ্বিনি প্রতিষ্ঠানই যথেষ্ট—যদি মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রতি ইহসান করেন।

স্মৃতিচারণ : ২

আমার নিজ চোখে দেখা—চাচা ছিলেন একজন পরোপকারী মানুষ। বহু মানুষকে তিনি সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। গরিব, অসহায়, এতিম মিসকিন, অভাবগ্রস্তদের প্রতি তিনি সর্বদা সাহায্যের হাত প্রসারিত করতেন। বিধবা-গরিব মেয়েদের বিবাহের ক্ষেত্রে টাকাপয়সা ও শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে বৃহত্তর শ্রীরামসি গ্রামে তিনি ছিলেন অগ্রগামী। যার জ্বলন্ত প্রমাণ আমি নিজেই।

তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের জননেতা। বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে তাঁর উপস্থিতি, সহযোগিতা ছিল চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন সালিশি বিচার-বৈঠকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতেন। তিনি ছিলেন বৃহত্তর শ্রীরামসি গ্রামের এক গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব। গ্রামের অনেক উন্নয়নে তাঁর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। আজও তাঁর মহৎ গুণাবলি নিয়ে মানুষকে রাস্তাঘাট, হাটবাজারে আলোচনা করতে শোনা যায়। এমন বহু ভালো গুণে গুণান্বিত ছিলেন আমার শ্রদ্ধেয় চাচা মরহুম জননেতা হাজি রেদওয়ানুল হক। চাচা আমাকে খুব স্নেহ করতেন এবং আমিও চাচাকে সর্বদা শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতাম। তাঁকে দেখে আমি অনুপ্রাণিত হতাম এবং বহু বিষয়ে তাঁর থেকে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা অর্জন করেছি।

পরিশেষে শ্রদ্ধেয় চাচা মরহুম হাজি রেদওয়ানুল হকের জন্য প্রাণভরে দুআ করি, আল্লাহ তা'য়ালা যেন প্রিয় চাচাকে জান্নাতুল ফিরদৌসের উচ্চ মাকাম দান করেন। তাঁর কবরের জীবন যেন শান্তিময় হয় এবং জান্নাতি বিছানা দ্বারা যেন আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর কবরটি সুসজ্জিত করে রাখেন। আ-মিন।

লেখক : শ্রীরামসি দিঘিরপার।

Esteemed individual

Shoyel Rashid Choudhury

Mohammed Redwanul Hoque was a highly esteemed individual in my life. He was my beloved father-in-law, a distinguished businessman, a devoted social worker, and a respected political figure. I was blessed with the opportunity to observe him closely, and I witnessed that his speech was always consistent with his actions. Despite living in the UK, his heart remained firmly attached to his homeland, and he possessed a sincere love for its people.

The passing of my noble elder has been a profound loss to me. I pray that Allah bestows His infinite mercy upon him & grants him forgiveness and admits him into Jannatul Firdous without reckoning.

Writer : Eldest Son-in-law

রেদওয়ানুল হক এক কিংবদন্তির নাম

এমলাকুল হক

আমার বাবা মরহুম রেদওয়ানুল হককে নিয়ে কিছু স্মৃতি, তাঁর সাথে কাটানো আমার সময় ও অভিজ্ঞতা নিয়ে আমার আজকের লেখা।

আমার বাবাকে নিয়ে লিখতে হলে তাঁর ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক যে বিষয়েই আলোচনা করি না কেন, তিনি তাঁর জীবনে সর্বক্ষেত্রেই সফলতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। কোনো মানুষই জীবনে সব দিক থেকে পরিপূর্ণ থাকে না। সবার জীবনেই ভালো-মন্দ ও ভুলত্রুটি থাকে। কিন্তু পরিশেষে আমরা একজন মানুষের জীবদ্দশায় পরিবারের প্রতি তাঁর দায়িত্ববোধ, আশপাশের মানুষের প্রতি তাঁর অবদান, তাঁর জীবনের অর্জন, মানবকল্যাণে তাঁর ভূমিকা—এই সবদিক বিবেচনায় নিয়েই আমরা একজন মানুষকে বিচার করি। আমরা কোনো মানুষকে তাঁর জীবদ্দশায় মূল্যায়ন করি না। আর তাঁর কাছ থেকে তাঁর পরিবার, আত্মীয়, পাড়াপ্রতিবেশী, বা এদের ভালোর জন্য এদের জীবনের উন্নতির জন্য তাঁর ভূমিকাকে আমরা সচরাচর সঠিক মূল্যায়ন করি না আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানি না বা মানতে রাজি হই না। কিন্তু সেই মানুষই যখন আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যায় বা যখন এই মানুষকে আমরা হারিয়ে ফেলি, তখনই আমরা সেই মানুষটির আসল মূল্য, তাঁর প্রয়োজন বা তাঁর অভাব উপলব্ধি করি। আর আমার মতে আমার বাবা সেই রকমেরই একজন ব্যক্তি ছিলেন। চলে যাওয়ার পর ছেলে হিসেবে তাঁর অভাব, তাঁর প্রয়োজন, তাঁর মূল্য উপলব্ধি করছি আর আমি শতভাগ নিশ্চিত যে, আমাদের পরিবার, আমাদের আত্মীয়, গোষ্ঠী, পাড়াপ্রতিবেশী, সারাটা গ্রাম তাঁর অভাব, তাঁর প্রয়োজন নিশ্চয়ই অনুভব করেন এবং সময়ে সময়ে ব্যক্তি রেদওয়ানুল হককে মনে পড়ে। তাঁর অনুপস্থিতি এবং

তিনি না থাকায় সবাই যে কী হারিয়েছি সেটা কেউ না কেউ একবার না একবার নিশ্চয়ই মনে করেন।

বাবার সাথে কাটানো আমার স্মৃতিতে মনে পড়ে ১৯৭৯ বা ১৯৮০ সালে তিনি যখন দেশে যান তখন আমি ছিলাম সাড়ে তিন বছরের শিশু। আমার ছোটো বোনের তখনো জন্ম হয়নি, তাই আমি ছিলাম পরিবারের সকলের ছোটো। মায়ের আদর তো পেয়েছি, কিন্তু বাবার আদর ছিল নিঃশব্দ। যদিও তাঁকে খুব ভয় পেতাম; কিন্তু এতটুকু বুঝতাম যে, তিনি আমাকে আমার অন্যান্য ভাইবোন থেকে আদালাভাবে আদর করতেন। মনে পড়ে একদিনের কথা। আমার নানাভাই আমাদের বাসায় থাকতেন। ওইদিন আমি খেলতে খেলতে দুষ্টুমি করে নানাভাইয়ের মশারিতে দিয়াশলাই দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিই। আগুন যখন আয়ত্তের বাইরে চলে গেল, তখন ভয়ে ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে আম্মাকে গিয়ে বলি। সবাই মিলে আগুন নেভালেন; কিন্তু আসল ভয় পেয়েছিলাম যখন আম্মা বললেন, 'আজ আসতে দে তোর আব্বাকে, তিনি তোর বিচার করবেন।' সে কথা শুনে আমি তো ভয়ে অস্থির। না জানি আজ কী হবে। আব্বা বিকেলে বাসায় আসার পর সব শুনলেন এবং আমাকে ডাকলেন। আমি ভয়ে কেঁদে কেঁদে তাঁর সামনে গেলাম এবং মনে মনে মার খাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিলাম। কারণ, আমরা সবাই জানি আব্বা খুবই রাগি একজন মানুষ। কিন্তু আমি জানি না তিনি আমার সেই দিনের কান্নাভরা চোখে কী দেখলেন। আমাকে অবাক করে দিয়ে তিনি আমাকে একটা চুমু খেলেন এবং বললেন 'এরকম আগুন দিয়ে আর খেলা করবে না, কোনো দিন বড়ো কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে'। এটাই আমার বাবার সাথে আমার প্রথম স্মৃতি। এরকম কত স্মৃতি আছে আমার মনে। একবার বলেছিলাম কমলা খাব। বাসায় এসেছিল কয়েক খাঁচা কমলা। আমরা ভাগ্যবান এরকম বাবাকে পেয়ে যিনি আমাদেরকে কখনো কোনো কিছুর অভাব পেতে দেননি। বড়ো মাছ, বস্তা বস্তা পেঁয়াজ, আলু, বড়ো বড়ো টিনের তেল, ঠেলাগাড়িভর্তি সবজি এই রকম ছিল আমার বাবার বাজার করার ধরন। এটাতো পুরো পরিবারের প্রতি তাঁর দায়িত্ব। তাঁর কাছে কোনোদিন কোনো লোক এসে কিছু চেয়ে খালি হাতে ফিরে গেছে বলে আমার মনে হয় না। আমাদের আত্মীয়কুটুম থেকে শুরু করে অপরিচিত কেউই আমার

বাবার কাছে কিছু চেয়ে কখনো খালি হাতে ফিরে যাননি। কাউকে কিছু দিলে তিনি নিঃসংকোচে দু'হাত খুলে দিতেন। বাইরে থেকে তাঁকে যতটা শক্ত দেখতে লাগত, আসলে ভেতর থেকে তিনি তার চেয়েও অধিক উদার এবং নরম মনের মানুষ ছিলেন।

মনে পড়ে আরও একদিনের কথা। আমরা এক বিয়েতে যাব বলে উপহার কিনতে বন্দরবাজারে তখনকার দিনের সবচেয়ে ভালো এক দোকানে যাই। তিনি ২৫০০-৩০০০/- টাকা দিয়ে একটি ডিনার সেট কিনলেন। তখনকার দিনে (১৯৮৪-৮৫) ২৫০০-৩০০০/- টাকা দিয়ে ডিনার সেট ছিল খুবই দামি। আমি তখন তাঁকে প্রশ্ন করলাম, এত টাকা দিয়ে এই উপহার এই বিয়েতে দেওয়ার দরকার কী ছিল? তখন তিনি আমাকে বললেন, 'জীবন কাউকে কিছু দিলে, কিছু খাওয়ালে এমনভাবে দেবে এমনভাবে খাওয়াবে যে, ওই মানুষটা সারা জীবন বলবে যে, অমুক আমাকে কিছু দিয়েছিল বা খাইয়েছিল। কারো জন্য কিছু করলে এমনভাবে করবে যে, ওই মানুষটি সারা জীবন মনে রাখবে'। এরকম স্মৃতি আছে বাবার সাথে। মাছ কিনতেন হিসাব ছাড়া, বাজার করতেন যেন বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান হবে। মানুষকে খাওয়ানো খুবই পছন্দ করতেন। কোনো কিছু কেনার পর দাম দিতেন দ্বিগুণের মতো। আমি একদিন তাঁকে মাছ কিনে টাকা দিয়ে আসার পথে জিজ্ঞেস করলাম যে, ২০০০-২৫০০/- টাকার মাছ তিনি কিছু না বলে কোনো দরদাম না করে ওই মাছ ব্যবসায়ী যত চাইল ততই কেন দিলেন? ওই মাছ তো ২০০০-২৫০০/- টাকার বেশি হবে না আর তিনি দিলেন ৪০০০/- টাকা। কেন এরকম করলেন? আপনি তো ঠকা খেলেন মাছ ব্যবসায়ীর কাছে। উত্তর দিলেন, তিনি ইচ্ছা করেই ওই লোককে বেশি টাকা দিয়েছেন। কারণ ওই লোক এই টাকা নিয়ে তাঁর পরিবারের জন্য খুশি হয়ে বাজার করে বাড়ি ফিরবে। আল্লাহ আমাদেরকে ধনসম্পদ দিয়েছেন, আমাদের ধনের ওপর তাদেরও হক আছে। তাই তিনি নিজে থেকেই কোনো কিছু কিনে বেশি দাম দেন। তিনি আসলে ঠকেন না, তিনি জেনেশুনেই এরকম করেন। সেই দিন আমি বুঝলাম তিনি কেন কোনো কিছু কিনে বেশি দাম দেন। তাঁর কথায় যে যা মনে করার করুক, তিনি এরকম করেন ওই লোকদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য। আর গরিবের মুখে হাসি ফোটানোতে যে পৃথিবীর মধ্যে

একটি সুন্দর প্রাপ্য যা সবাইকে দিয়ে হয় না। এরকম আরও কত স্মৃতি, কত অভিজ্ঞতা আমার বাবার কাছ থেকে সঞ্চয় করেছি, সে সব লেখে শেষ করা যাবে না।

তাঁর জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল তাঁর মামলা, যেটা আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাঁকে চালিয়ে নেওয়ার জন্য ওয়াদাবদ্ধ করেছিলেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় ওই মামলার শেষ দেখে যেতে পারেননি আমাদের নিজের কিছু লোকের কারণে। তাঁর জীবনের সকল উপার্জন ওই মামলার জন্য তিনি উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। ওই মামলা ছিল আমাদের গোত্রের ইজ্জতের লড়াই, অস্তিত্বের লড়াই। যদিও দুঃখজনকভাবে তিনি ওই মামলার চূড়ান্ত নিঃষ্পত্তি দেখে যেতে পারেননি, কিন্তু গত ২০/০৫/২০২৫ খ্রি. তারিখে আমরা ওই মামলার চূড়ান্ত ডিক্রি নিয়ে আকুব খাঁ তালুকের ২২.৭২ একর জমি আদালতের মাধ্যমে দখল সমঝে নিয়ে এবং লাল পতাকা পুঁতে সীমানা নির্ধারণ করা হয়। কেউ হিংসায় স্বীকার করুক আর না করুক, রেদওয়ানুল হকের কারণে আজ এই গোত্র তাদের হারানো সম্পত্তি ও বংশমর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে পেরেছে। তাই এটুকুই বলব, রেদওয়ানুল হক এক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। তিনি আমাদের অহংকার।

তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের আগে আওয়ামী লীগের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু ১৯৭৮ সালে জেনারেল ওসমানীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে 'জাতীয় জনতা পার্টি'-তে যোগ দেন। তিনি ছিলেন ওসমানীর একজন ঘনিষ্ঠ সহচর এবং জনতা পার্টির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে আমৃত্যু দায়িত্ব পালন করে যান। জনতা পার্টির জন্য তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। পার্টির জন্য তিনি অনেক অর্থব্যয়ও করেছেন এবং পার্টির কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর পরিশ্রমের কোনো কমতি ছিল না। যার দরুন পার্টি থেকে মরণোত্তর সর্বোচ্চ পদক প্রদান করা হয়।

আমার বাবা তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর যোগ্যতানুসারে সফলতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ইংল্যান্ডে তিনি ব্রিকলেন মসজিদের সূচনালগ্ন থেকে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তাছাড়াও তিনি বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনসহ কমিউনিটির অন্যান্য সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। তিনি ছিলেন আপসহীন এক ব্যক্তিত্ব। কমিউনিটির

মানুষের সেবার জন্য তিনি সর্বদা ছিলেন তৎপর। প্রবাসীদের ভোটাধিকার সংরক্ষণের জন্য ১৯৯৪ সালে তিনি মামলা দায়ের করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশের পক্ষে এই ইংল্যান্ডে থেকে তাঁর মালিকানাধীন সোনার বাংলা রেস্টুরেন্টে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য তহবিল সংগ্রহ থেকে শুরু করে শরণার্থীদের জন্য সাহায্য সংগ্রহে রাখেন অনন্য ভূমিকা। তখনকার দিনে দেশের সকল বড়ো বড়ো নেতা এই সোনার বাংলায় এসে মিটিং করতেন এবং সকলের জন্য তাঁর আপ্যায়ন ছিল সব সময় উন্মুক্ত। এককথায় তিনি মানুষের কল্যাণে আজীবন কাজ করে গেছেন এবং আজও তিনি তাঁর সমাজের মধ্যে আমাদের মাঝে চিরস্মরণীয় আছেন এবং আগামীতে থাকবেন।

আমি তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

এক মানবিক ব্যক্তিত্ব

মো. গোলাম রাসুল রিমন

সাদাকে সাদা আর কালোকে কালো বলা যে কজন স্পষ্টভাষী মানুষ শ্রীরামসি গ্রামে আছেন বা ছিলেন, শ্রদ্ধাভাজন চাচা মরহুম আলহাজ মো. রেদওয়ানুল হক ছিলেন তাঁদের অন্যতম। যিনি প্রবাসে থেকেও শ্রীরামসি গ্রামের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সালিশ ব্যক্তিত্বেও অনেক ভূমিকা রেখেছেন।

যুক্তরাজ্যে শ্রীরামসি কমিউনিটিকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে তাঁর অবদান ছিল অনস্বীকার্য। লোকচক্ষুর অন্তরালে দানশীলতা ছিল তাঁর একটি বিশেষ গুণ। এই বহু গুণে গুণান্বিত ব্যক্তির প্রতি রইল আমার এবং আমার পরিবারের পক্ষ থেকে অতল শ্রদ্ধা।

মেজো চাচা স্মরণে

মো. আহসানুল হক লিপু

আমার চাচা মরহুম রেদওয়ানুল হক ছিলেন একজন দয়ালু, পরোপকারী এবং বিনয়ী হৃদয়বান মানুষ। সমাজে তিনি একজন ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। আমর চাচা শুধু পরিবারের একজন সদস্য ছিলেন না, তিনি ছিলেন আমাদের একজন অভিভাবক, একজন পথপ্রদর্শক। তিনি ছিলেন আমাদের দুঃসময়ে সাহসের দেওয়াল। তাঁর আদর, ভালোবাসা আর কড়া শাসনে ছিল এক অন্যরকম মমতা। আমার মনে আছে, ছোটোবেলায় একবার আমার জন্য তিনি অনেক রাজহাঁস নিয়ে এসেছিলেন। আমি আম অনেক পছন্দ করতাম। আমার মায়ের মুখে শোনা, আমার চাচা নাকি আমাকে তাঁর পেটের ওপর বসিয়ে আম খাওয়াতেন।

আমার পড়াশোনার প্রতি তাঁর যত্ন ছিল অসাধারণ। ছোটোবেলায় একবার তিনি আমাকে বলেছিলেন, যদি আমি এসএসসি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করি, তাহলে তিনি আমাকে একটি কম্পিউটার কিনে দেবেন। আমার চাচার কথায় লেখাপড়ার প্রতি আমার আরও মনোযোগ বেড়ে যায়। যেহেতু আমি তখন অনেক ছোটো ছিলাম, তাই কম্পিউটারের প্রতি অনেক দুর্বলতা ছিল। আমি চাচার সেই প্রতিশ্রুতির কথা মনে রেখে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতে শুরু করি। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস; আমার পরীক্ষা চলাকালীন তিনি আমাদের ছেড়ে চিরদিনের মতো চলে যান। আর কম্পিউটার তো আমি পরীক্ষার অনেক আগেই কিনেছিলাম। কিন্তু আমার দুঃখ একটাই, আমার চাচাকে আমার পরীক্ষার ফলাফল আর জানাতে পারলাম না।

আজও তাঁর বলা সেই কথাগুলো আমার কানে ভেসে আসে। আমি জানি, তিনি যদি বেঁচে থাকতেন, তিনি আমার ফলাফল দেখে গর্ববোধ করতেন। চাচার ভালোবাসা, স্নেহ আর উৎসাহ আমার জীবনের অন্যতম বড়ো শক্তি। তিনি নেই, কিন্তু তাঁর ভালোবাসা ও অনুপ্রেরণা আজও আমাকে জীবনের পথ দেখায়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমার চাচার সকল ভুলত্রুটি ক্ষমা করুন এবং জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন। আ-মিন।

আমাদের নানাছাব

ডলি, লিলি ও মিজান

শ্রদ্ধেয় নানাছাব সম্বন্ধে বলতে গেলে তো বলা শেষ করা যাবে না। অনেক কিছুই বলার আছে, তাঁর সঙ্গে অনেক স্মৃতি মনের মাঝে ভেসে ওঠে। বিশেষ করে যখন আমরা শিবগঞ্জের সেনপাড়ায় থাকতাম, তিনিও সেই সময় সেনপাড়ায় ছিলেন, সেই সুবাদে আমাদের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেছিলেন। তাই প্রায়ই বাসা থেকে খবর পাঠাতেন, 'তোমরা আমাদের বাসায় চলে এসো, আম-কাঁঠালের দাওয়াত'। পরে আমি, লিলি আর মিজান চলে যেতাম, আর কি যে আনন্দফুর্তি করে খেতাম, যা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। তিনি ছিলেন এক জন সাহসী, সৎ ও ভদ্রমানুষ। আল্লাহ তাঁকে বেহেশত নসিব করুন। আ-মিন।

My Abba

Halima Khatun (Mukta)

My Abba was one of the most generous souls I've ever known. He gave without hesitation—his time, help, wisdom, and love. Whether it was family, friends, or even strangers in need, he showed up without expecting anything in return. He believed in doing good quietly and consistently.

He was a man of his word. If he promised something, you could rely on it being carried out—regardless of its size. Integrity wasn't just a value he believed in; it was the way he lived every day of his life.

As the youngest child, I had a special bond with him. I'll admit—I often got my way. Perhaps it was because he had a soft spot for me, or maybe he simply enjoyed seeing me happy. Whenever I wanted something, my wishes were granted—whether it was food, clothes, or anything else. He never made me feel like I was asking for too much. He was never reluctant with his money. Alhamdulillah for everything my Abba provided for us, with the provision of Allah. I feel very privileged.

Growing up, I experienced a very strict upbringing. Abba set clear rules, firm boundaries, and held high expectations. At the time, I often felt like I was missing out on certain things, wondering why he wouldn't allow what others around me could do. But now, I understand. I

see that his strictness wasn't about control—it was about protection. He was trying to keep me safe, guide me towards a better path, and build a strong foundation for my future. And for that, I am deeply grateful. I thank him for every "no" that came from love, and for every limit that came from care.

Beneath that firmness, Abba possessed a deeply gentle and loving heart. He didn't always express it in words, but he demonstrated it through quiet acts—in his sacrifices, his patience, and his unwavering support.

One memory that always stays with me is from an Eid celebration many years ago. Abba took me shopping for my Eid clothes. I was being fussy, changing my mind, unsure of what I wanted. We walked around for hours, trying store after store. The thing is—we were fasting. It was Ramadan, and neither of us had eaten or drunk anything all day. But not once did he complain. He just smiled and kept walking beside me, determined to make sure I found something I loved. That was who he was-selfless, kind, and always putting others first.

When I first started cooking, Abba would always praise whatever I made. He used to say it was better than Amma's cooking - even though I knew that wasn't true. Amma has always been the best cook, and everything I know, I learnt from her. But those words from Abba meant everything. He encouraged me, made me feel capable, and gave me the confidence to keep going. I wish he was here today so that I could make food for him.

Losing him has created a space that no one else can quite fill, but the love he shared, the lessons he imparted, and the strength of his presence will remain with me always. He was, and always will be, the heart of our home.

I miss you, Abba. Every day. Thank you for everything. May Allah grant Abba the highest rank in Jannah and elevate his grave. May Allah forgive his sins and accept the illnesses he endured due to his health conditions in his final days as a means of purification. Ameen.

In his final days, Abba endured great pain with patience and dignity. Even through his suffering, he never complained. Watching him go through such hardship broke our hearts, but it also reminded us of his strength, his resilience, and his unwavering trust in Allah. His pain was visible, yet he remained composed—never letting it shake his faith. That strength continues to inspire me every day. May all that he bore be counted as a means of his forgiveness and elevation in the Hereafter. Ameen.

আমাদের মেজো দাদা

নিশাত তাসনিম প্রমি ও ফারিহা তাসনিম ঐশী

আমাদের মেজো দাদা ছিলেন এমন একজন মানুষ, যাঁর উপস্থিতিতে ঘর ভর্তি হয়ে যেত প্রাণ আর হাসিতে। দাদার মন ছিল উদার, স্নেহে ভরা। আর মানুষকে একত্রে রাখার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁর মধ্যে। দাদার সেই জিপটা আজও চোখে ভাসে।

দাদার অভ্যাস ছিল অনেক বাজার করা। সবাই মিলে একসাথে খাওয়া, হাসাহাসি, গল্প, আয়োজন—তাতেই ছিল দাদার আনন্দ।

একবার দাদা লন্ডন থেকে এসেছিলেন। সেবার তিনি আমাদের সাথেই ঈদ করেছিলেন। সেই ঈদটার আনন্দ ছিল অন্যরকম। দাদার সঙ্গে একসাথে মেহেদি গাছের পাতা বেছে আমরা কত গল্প করেছি, কত হাসাহাসি! আজও সেই মুহূর্তগুলো মনে পড়লে মন ভরে যায়। দাদার সঙ্গে কাটানো সেই ঈদ যেন ছিল শৈশবের সবচেয়ে উজ্জ্বল স্মৃতিগুলোর একটি।

আমাদের দাদি ছিলেন ভাইবোনদের মধ্যে বড়ো, তাই সবাই তাঁকে খুব ভালোবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন। আর দাদা ছিলেন দাদির অতি আদরের ভাই। বাবার মুখে আমরা প্রায়ই শুনি দাদার গল্প। কীভাবে তিনি সবাইকে সাহায্য করতেন, আর কেমন করে নিজের পরিবারকে সবসময় আগলে রাখতেন।

দাদার মন ছিল সমুদ্রের মতো বিশাল। তিনি সবসময় সবাইকে নিয়ে বাঁচতে ভালোবাসতেন। সবাই ছিল নিজের মানুষ। তাঁর হাসি, তাঁর যত্ন, তাঁর গল্প এখন শুধু স্মৃতিতে। কিন্তু সেই স্মৃতিগুলোই যেন এখনো আমাদের ঘিরে রাখে।

মানুষ একদিন চলে যায়, কিন্তু তাঁর রেখে যাওয়া চিহ্ন, ভালোবাসা আর মায়া কখনো মুছে যায় না। আমাদের মেজো দাদা ছিলেন তেমনই একজন মানুষ। যাঁর জীবন, আচরণ আর ভালোবাসা আমাদের পরিবারের ইতিহাসে চিরস্থায়ী হয়ে আছে।

আমরা আজও তাঁকে মনে রাখি ভালোবাসায়, শ্রদ্ধায়।

Man of Deep Faith

Taslima Haque Shuwara

My grandfather was a man of quiet strength and deep faith. His calm presence, like a silent dua'a answered before it was spoken, inspires admiration and respect in those who knew him.

When I was little, he would bring home my favorite fruits, arms full, smile wide, and his acts of kindness made me feel loved and appreciated. His gentle gestures, like letting me eat from his plate and asking for a little massage, create a sense of warmth and gratitude.

Those small moments became the pillars of my childhood, teaching me that love doesn't need to be loud to be lasting. That kindness can be a legacy.

He loved the Holy Qur'an with a tenderness that stayed with him until the end, inspiring my own faith journey. He prayed with a heart that clearly knew its Lord, teaching us that true dignity lies in humility, and that guidance is reflected in how one lives, not just in words.

Though he's no longer with us,his memory lives quietly in the folds of my heart. There are so many moments I wish he could witness, my milestones, my growth, the life unfolding ahead of me. I still carry the hope that, in some unseen way, he is proud, smiling, close.

And while I cannot sit by him again in this life, I carry

hope in the promise of reunion, in a place where no hearts break, and no goodbyes exist. May Allah forgive him, reward him for every silent sacrifice, and make his grave a garden of light and mercy.And may we meet again in Jannah.

Writer : Grand Daughter

My Dada

A leader within the wider community

Mohammed Emjadul Hoque Mahdi

Redwanul Hoque (Dada-Grandfather) was one of the early pioneers of the Bangladeshi community in London. Born in the village of Shreeramishi, in the Jagannath Pur Upazila in Sunamganj, Bangladesh, he emigrated to the United Kingdom in the early 1960s, as part of the first generation of Sylheti settlers who established a new life in East London. He proved himself not only as a provider for his family but also as a leader within his wider community.

Above all else, he was a devout Muslim. His faith guided every aspect of his life, and he was rarely seen without his Tupi (prayer cap) and his distinctive wooden walking stick, embossed with gold plating. The faint mark on his forehead from decades of prostration served as a visible testament to his piety.

Family ranked just below faith. He was recognised as a unifier—a man who believed no one should go hungry or be left behind. His home was always welcoming, his table always open. Nearly all of his extended family who arrived in Britain did so with his assistance, whether through sponsoring immigration, finding accommodation, or securing employment. Any money he did not spend on those close to him in London, he sent back to Bangladesh to support relatives still there.

In the late 1960s, he founded Sunar Bangla, the first explicitly Bengali-named restaurant on off Brick Lane,

Hanbury Street. At a time when many restaurateurs opted for "Indian" branding to appeal to a broader market, he insisted on proudly declaring his Bengali identity—the name translating to "My Golden Bengal." The restaurant became a cornerstone for the community, a gathering place filled every day with locals and extended family, where the values of hospitality and togetherness were lived.

As the local Bangladeshi Muslim community grew, Dada's focus shifted from hospitality to worship. Before a mosque existed, he used the basement kitchen of Sonar Bangla as a space for congregational prayer (salah)—an early, informal masjid that served neighbours and kin. As attendance increased, he and other community members helped raise funds to acquire the historic worship building at 59 Brick Lane—a structure with a long, layered religious history—so it could be made into a permanent mosque. The building originally opened in 1743–1744 as a French Protestant (Huguenot) chapel, became a synagogue in 1897, and was converted into a mosque in 1976; today it is known as Brick Lane Jamme Masjid, a recognised spiritual centre for the area.

Jamme Masjid on Brick Lane remains a landmark at the corner of Brick Lane and Fournier Street, symbolising the East End's successive waves of migration and faith, and it continues to serve a large British-Bangladeshi community.

Over time, the former basement prayer space at Sonar Bangla developed into an office supporting the family business—a practical continuation of that same ethic of service and provision. My father has long worked from that space, and I now do the same, linking faith, enterprise, and family across generations.

Respected and admired—sometimes feared for his stubbornness and strictness—Redwanul Hoque was

regarded as the leader of his family and community. People listened to him, and few dared confront him directly. Yet behind his stern authority lay a man of generosity, faith, and kindness. His life balanced discipline, tradition, and deep love.

When he passed away, there was an extraordinary outpouring of grief and respect. His janaza was held in London and again in Bangladesh, where he was laid to rest. For nearly two weeks, the family home in East London was filled with relatives, friends, and community members. The large number of mourners reflected not only the love his family felt for him but also the profound impact he had on his community in both Britain and Bangladesh.

The Reserved Seat and the Tea

In our household, everyone knew that Dada had his own seat. Whether in the living room, the kitchen, or the dining room, there was always one chair that belonged solely to him. It wasn't written down or officially declared, but it was understood—an invisible rule in our family. Nobody sat there.

Nobody, that is, except me.

I was his favourite grandchild, and I knew it. When I was five, I lovingly decided one day to claim his seat in the kitchen. Noon sunlight bathed the room when he entered, expecting to find it unoccupied. Usually, anyone else would have been gently chided for sitting there. But with me, he always made it special. He would pretend to be stern, his deep voice jokingly scolding, while I giggled and playfully argued that it was now my seat.

He chuckled, amused by my defiance, and teased me: "If you want my seat, do you want anything else as well?"

I didn't recognise the sarcasm. I took it as a challenge.

Boldly, I asked, “If you’re offering, then I’d like tea and biscuits too.”

His eyes widened in surprise, then he laughed—a gentle, deep laugh. To everyone’s amazement, he walked over to the kettle, turned it on, and started making tea. My parents hurried in, confused by the noise, expecting to find me dangerously fiddling in the kitchen. Instead, they saw their father, who had never made tea for himself before, quietly boiling water for me.

They were speechless. To them, this was unthinkable—a reversal of tradition and authority. Yet he silenced their protests, waved them off, and carried on. He served me tea and biscuits, and we sat together, sharing food and laughter.

To this day, that memory is retold with disbelief. It was the one time the man everyone served turned the tables and served me. To me, it is proof of the love we shared, a rare glimpse of tenderness hidden behind his authority.

The Lesson of Unity

Even as his health declined and his body grew weaker, Dada’s role as a teacher and leader remained steadfast. In one of his final lessons to us, he spoke not about faith or business, but about family.

I remember a day when my sister and I, along with our cousins, were arguing fiercely over a football match. My sister, upset and in tears, sought comfort from him. She told him it wasn’t fair—that I was bigger, stronger, and always winning.

Though frail, his voice still carried authority. He explained to her, and to all of us gathered there, that the rivalry between us was meaningless. “It does not matter who wins or loses,” he said. “When one of us wins, we all win, because we are one family.”

He told my sister not to be upset about my victories but to understand that, like him, I would grow up to be someone who bore responsibility for the family, someone who provided and protected. “Be kind to him now,” he told her, “and he will give back to you in ways you cannot imagine when you are older.”

At the time, my sister thought she was being scolded. But in reality, it was his way of planting a seed: a reminder that unity and love mattered more than competition. Today, those words feel prophetic.

The Long Goodbye

When Dada passed away, it was not a private sorrow but a communal one. Our flat became a centre of mourning and remembrance. For nearly two weeks, the rooms were filled with people—family, friends, neighbours, community leaders—all coming to pay their respects.

As a child, I did not fully understand the sadness. To me, it felt like a festival of family, cousins everywhere, the house alive with voices and stories. But in hindsight, I understand: this was the weight of his legacy, the love and respect he had earned over a lifetime.

His janaza was performed not once but twice—first in Bricklane Jamme Masjid London, then again in Foodball field of Shreeramishi, in Jogannathpur, Bangladesh. In death, as in life, he belonged to both worlds. And in both, he left behind a community bound together by the values he had lived by: faith, family, and unity.

My Memory of my Dada

Through a Child's Eyes

Mahira Asma Hoque

When I think of my Dada (grandpa), I'm often caught between the small memories from my childhood and the understanding I've gained as I've grown older. I was only six when he died, so much of what I remember is influenced by how I saw the world back then. To be honest, I didn't always feel close to him. As a child, I thought he was loud, strict, and even a little frightening. He made me cry more than once—and sometimes, I felt like he was closer to my older brother than to me.

One memory that always stays with me is the argument over the television. My brother and I would come home from school, eager to watch our favourite cartoons, but Dada had the news channel on. And it wasn't just background noise-he was glued to it. Politics, current affairs, speeches-he watched it all with great seriousness. At the time, we didn't understand it. We'd groan and sigh, wondering why grown-up talk always had to take precedence over cartoons. Looking back now, I realise it was one of the ways Dada stayed connected to the world—always learning, always engaged, even in his quiet way.

Growing up, I heard more stories about Dada from my parents, uncles, and aunts—stories that gradually changed my perception of him. They told me he was a deeply kind

man, very religious and firmly grounded in his beliefs. He helped others quietly, never seeking praise, and he cared for his family more than he ever outwardly showed.

One gesture I cherish now is the gift he left for me and all my cousin sisters: a pair of beautiful gold earrings. He gave them to us while we were still little girls—too young to wear them, too young to even understand their significance. But now I understand. Dada gave us those earrings because he knew he might not be there to see us grow up. He wouldn't get to see us dressed up for weddings or celebrate milestones with us. So he left us something that would last—a memory in the form of gold, something we could keep close to us even when he was no longer there.

It touches me deeply now, knowing that behind his strictness lay a man full of love. He might not have been the grandfather who sat us on his knee, told stories, or played games with us. But he expressed his care in his own way—through tradition, responsibility, and quiet acts of thoughtfulness. He was constantly thinking of our future, wanting to leave something meaningful for us to hold onto.

As a child, I didn't understand him. But as an adult, I respect him deeply. I believe we all carry different pieces of the people we love in our memories—some vivid, some puzzling, and some that only reveal their meaning with time. For me, Dada is someone I've come to understand more deeply after his passing than I ever did while he was alive. In that way, his presence continues to live on—in the stories shared, the memories held close, and even in the earrings I still treasure. He also gave me my middle name, a quiet gift that keeps a part of him with me always.

Now, when I think of Dada, I no longer feel fear or sadness. I feel gratitude—for everything he sacrificed to move here, for leaving behind the life he knew to build something better for us, and for enduring hardship so his children and grandchildren could have opportunities he never had. I appreciate the quiet wisdom in his words and the way he looked after us, even when we didn't fully realise it. Most of all, I feel peace—knowing that his love was there all along, even if it wasn't always easy to see.

May Allah grant Dada the highest ranks in Jannah, make his grave a garden of peace, and reward him endlessly for the sacrifices he made for our family. May we be a continuous source of reward (adaqah j riyah) for him, honour his legacy through our actions, and may we all be reunited with him one day in eternal joy. Ameen.

Memory of My Nana

Sharier Khadim Mihad

I was only six years old when Nana passed away, but even at that young age, I remember how loving, caring, and kind he was. He had a certain presence about him—gentle, firm, and dignified—that I really admired. Looking back, I wish I could have appreciated him more, now that I understand the kind of person he truly was.

One memory that always makes me smile is when we were sitting together on the kitchen chairs. My Nana suddenly pulled out what looked like real teeth—his fake dentures or retainers—and I had no idea those even existed! I looked at him in complete shock and started screaming, absolutely terrified! He just laughed and laughed, and it became one of those funny, innocent moments that stay with you for life.

After thanking Allah, it's through Nana's efforts and sacrifices that I'm in the UK today. His hard work opened the door for so many blessings and opportunities in my life—something I will always be grateful for. I often wish he were present during the milestones I've reached—me growing up, graduating, getting married, and everything else that's followed. I hope he would've been proud. And Insh 'All h, I aim to carry forward his character, his generosity, and his love in everything I do.

May Allah forgive him and have mercy on him, grant him peace and pardon him. May He honour his resting place, expand his grave.

এক আলোকবর্তিকার গল্প

এমদাদুল হক টিপু

জীবন আমার হয়েছে ধন্য
রুফিয়া-রেদওয়ান মা-বাবার জন্য
হয়েছি বড়ো কঠোর শাসনে
ন্যায়পরায়ণ বাবার আদর্শে
দাতা-বাপের সন্তান হয়ে অনুসরণ
করেছি আমরাও সেই পথ
নিরন্তর করছি চেষ্টা রাখিতে
ধরিয়া তোমার মহিমা যুগপৎ।

এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়ে
আলোর প্রতীক হয়ে এলে এই ধরণিতে
প্রমাণ করে গেলে তোমার কার্যকলাপে
না এলে তুমি এই পরিবারে
বংশের প্রতীক ধরে রাখতে পারত না কোনো একজনে
৫০ বছর পরে মামলার ডিক্রি শেষে
প্রতিষ্ঠিত করে গেলে মিরাশদার রূপে।

দিয়েছে তোমায় আঘাত কতেক আপনজনে
ক্ষমা তুমি করেছ ওরা বুঝতে পারেনি বলে
ওরা ভেবেছে বোকা তুমি
ধরতে পারো না তাদের চাতুরী
খেলাবে তোমাকে দিয়ে
আর নিজে করবে মাতব্বরি
সংঘবদ্ধ হয়ে দিল কষ্ট তোমায় বার বার
দেয়নি স্বস্তি যতদিন যাওনি পরপার।

বুঝেনি তোমায় তারা হয়েও আপনজন
দেখেছে স্বার্থ শুধু দেখেনিতো মন
প্রতিঘাত না করে দিলে
দেখিয়ে তোমার বড়োত্ব
হারিয়ে আজ তারা বুঝতে
পারছে তোমার গুরুত্ব।
তোমার আর্থিক সফলতায়
জ্বলে উঠেছিল কিছু আপনজন হিংসায়
না করে তোমার ক্ষতি
যেন ছিল না তাদের গতি।
অগোচরে করে তোমার গুণগান
করে স্বীকার তোমার সকল অনুদান
তবে উপস্থিতিতে তোমার পরিবারের
চায় না দিতে তোমার প্রাপ্য সম্মান।

তোমার উদারতা আর উদাসীনতা
তাদের করেছিল উৎসাহিত
ভেবেছিল মামলায় হেরে
তুমি হবে ভিখারির মতো
হাসবে তারা তোমায় নিয়ে
তাদের হবে বাজিমাত
মূর্খ তারা বুঝতে পারে নাই
রয়েছে তোমার মাথার ওপর
করুণাময়ের হাত।

সর্বোচ্চ চেষ্টার পরেও পারেনি
তোমায় করতে পথভ্রষ্ট
রয়েছ অটল তুমি
না হয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট
ক্ষান্ত হয়নি তারা
করে শুধু তোমায় আঘাত

দিয়েছে তোমার সন্তানদেরও
অগণিত নির্ঘুম রাত
মিরজাফরের পাঠ তারা করেছে ঠিকঠাক
আর করেছে ক্ষমা তাদের
তোমারই পুত্রদ্বয় এমদাদ-এমলাক
পেয়েছে যে শিক্ষা তারা তোমার থেকে
ভুলিবে না নির্ঘাত।

দুঃখ শুধু আজকের বিজয়
হয়নি তোমার দেখা
তবে শ্রীরামসির ইতিহাসে রবে
তোমার নাম সর্বদা লেখা।

সন্তুষ্ট থেকো আমাদের কার্যক্রমে
ভালো থেকো আরশের ছায়াতলে
দুআ করি আমরা সকলে।
পারি না আমরা তোমার জন্য কিছু করিতে
লিপিবদ্ধ করে গেলাম
তোমার জীবনী এই পুস্তকে
ক্ষমা করে দিয়ো আমাদেরকে
সুখে থেকো তুমি পরপারে।

মামলার পাতা

এক জীবনের ধৈর্য

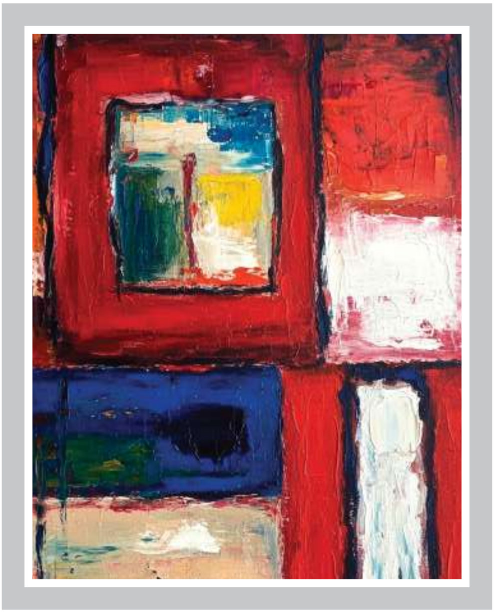

এই অধ্যায়ে ৫০ বছর ধরে চলা জায়গাজমি সংক্রান্ত মামলার দীর্ঘ লড়াই ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তির বিষয় তোলে ধরা হয়েছে

রেদওয়ানুল হক ও একটি ঐতিহাসিক মামলা

নিষ্পত্তিতে পঞ্চাশ বছর

হোসেন আহমদ

প্রাক্‌কথন

মায়ের কাছ থেকে শুনেছি, মেজমামা রেদওয়ানুল হক আমার নানার মতো হয়েছেন। আমার নানা মোহাম্মদ মাহফুজুল হক অত্যন্ত শৌখিন ছিলেন। তিনি পরিচ্ছন্ন জীবনযাপন করতেন। মামা অনেকটা তা-ই হয়েছেন। সাদা লুঙ্গি, পায়জামা পাঞ্জাবি ও ফতুয়া পরতেন। হাতে একটি বিলেতি ছাতা রাখতেন। আমার মেজমামা অনেক বড়ো মনের মানুষ ছিলেন। তিনি তাঁর আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী এবং গ্রামের সকলের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখতেন। মামার কণ্ঠ ছিল বজ্র। আমরা ছোটোরা কিছু ভয়ে থাকতাম। তিনি বাড়িতে থাকলে বাড়িভরা মানুষ থাকত। তিনি সালিশি ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বাড়ির বাংলোয় সব সময় সালিশ বসত। মামা দেশে-বিদেশে প্রবাসীদের স্বার্থরক্ষায় সোচ্চার ছিলেন। এই নিয়ে নানা আন্দোলন করেছেন।

মামাদের বাংলোঘর অতি পুরাতন। আসাম প্যাটার্নের তৈরি। এই বাংলোটি এখন জরাজীর্ণ, ব্যবহার হচ্ছে না। অথচ একসময়ে প্রখ্যাত আলিম ও পির আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী সাহেবসহ অনেক বিশিষ্ট আলিম এই বাংলোয় অবস্থান করেছেন। এই বাংলোতে জাতীয় নেতা আব্দুস সামাদ আজাদ, বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকীসহ অনেক রাজনৈতিক নেতা এবং প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কারণে এখানে এসেছেন। মামারা তাঁদেরকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতেন। বিশেষ করে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময় জাতীয় পর্যায়ের খেলোয়াড়রাও এখানে আসতেন।

লন্ডনে মামাদের সোনার বাংলা রেস্টুরেন্ট ছিল। এই রেস্টুরেন্টের অনেক সুনাম ও সুখ্যাতি রয়েছে। প্রখ্যাত সাংবাদিক-লেখক এমআর আখতার মুকুল 'লন্ডনে ছক্কু মিয়া' বইয়ে সোনার বাংলা রেস্টুরেন্টের নাম প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেছেন।

মামা মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবীর এমএজি ওসমানীকে ভালোবাসতেন। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত জাতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিয়ে আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও পার্টির অন্যতম সংগঠক হয়েছিলেন। তিনি রাজনৈতিক কারণে ঢাকায় আসলে হোটেল ওসমানীতে থাকতেন। হোটেলের পাশেই জনতা পার্টির অফিস ছিল। আমি ঢাকায় থাকালীন অনেক সময় হোটেলে তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়েছি। সম্ভবত ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি কি মার্চ মাসে মামার সঙ্গে দেখা করতে যাই। মামা আমাকে বললেন, আব্দুস সামাদ আজাদের সঙ্গে দেখা করবেন। আব্দুস সামাদ আজাদ তখন জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় উপনেতা। আমি ভাবনায় পড়ে গেলাম, কারণ নিয়ম অনুযায়ী সাক্ষাতের পূর্ব অনুমতির প্রয়োজন হয়। মামার যেই কথা সেই কাজ। তিনি প্রস্তুত হয়ে বের হলেন। সাথে আমিও এলাম। মিন্টু রোডের অফিসে পৌঁছে পরিচয় দিয়ে সাক্ষাৎ চাইলাম। সাক্ষাৎ পেলাম। অনেক নেতা বসা আছেন। আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতা আমির হোসেন আমু, তোফায়েল আহমদ, মোহাম্মদ নাসিমসহ অনেকে। মামা তাঁর সঙ্গে কোলাকুলি করলেন। তারপর পাশে একটি চেয়ারে বসলেন। কুশলাদি বিনিময়ের পর আব্দুস সামাদ আজাদ স্বাধীনতাযুদ্ধে মামা এবং তাঁর সোনার বাংলা রেস্টুরেন্টের অবদানের কথা বলেছিলেন। আব্দুস সামাদ আজাদ আরও বলেছিলেন, একাত্তরের ৩১ আগস্ট শ্রীরামসিতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক বর্বরতম গণহত্যার কথা। সেদিন তারা বাজার, স্কুল, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও গ্রামের বহু বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল। তিনি যখন এই বর্বরতম গণহত্যার স্মৃতিচারণ করছিলেন তখন আমি আমার শৈশবে চলে যাই। তখন আমার বয়স চার হবে। সে দিনের ভয়াবহ তাণ্ডব আমাদের বাড়ি থেকে সবাই দেখেছিলেন। আগুনের লেলিহান শিখা, গুলি ও বোমার বিকট আওয়াজ সকলকে কাঁদিয়েছে। মামাদের বাড়ি আমাদের বাড়ির দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রায় ৫/৬ মাইল দূরে। আমার মা তখন কাঁদছিলেন আর বলছিলেন, 'আমার মা ও ভাইয়েরা হয়তো বেঁচে নেই।' সৌভাগ্যক্রমে আমার ছোটো মামা

সুলেমানুল হক বেঁচে যান। তিনি ভালো ফুটবলার ছিলেন। লাইনে দাঁড়াতে দেখে পরিচিত একজন রাজাকার তাঁকে বাঁচানোর ফন্দি করে অন্য একটি ফরমায়েশ দিয়ে লাইন থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং ইশারায় গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বলে। বড়ো মামা লোকমানুল হক অন্য কোথাও ছিলেন। আর নানি নাকি একটানা নামাজ আর পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন। সেদিন হাইস্কুলের শিক্ষক মাওলানা ছাদ উদ্দিনসহ চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী এবং গ্রামের শতাধিক নিরীহ জনসাধারণকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাদের এদেশীয় দোসরদের সহযোগিতায় নির্বিচারে হত্যা করে ইতিহাসের এক কালো অধ্যায় রচনা করেছিল। আমি সকল বীর শহিদকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

সে দিনের ঘটনার পর পাকিস্তানি সৈন্যরা বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। তারা আমাদের পাটলী গ্রামে আক্রমণ করবে—এ খবর পেয়ে আমাদের বাড়ির ছোটোদের ও মহিলাদের নিরাপদ জায়গায় পাঠানো হয়। আমার মনে আছে, আমিও তাদের সাথে নৌকাযোগে বিশ্বনাথের কালীজুরি ও পরে আগ্নপাড়া গ্রামে অবস্থান করি। আরও মনে আছে, একটি দরিদ্র হিন্দু পরিবার কোথাও যেতে না পেরে তারা আমাদের বাড়ির গোয়ালঘরে মুলিবাঁশের ছাদের ওপর আশ্রয় নিয়ে সেখানে সংগোপনে কিছুদিন অবস্থান করে।

মামার সাথে আমার অনেক স্মৃতি রয়েছে। বিশেষ করে স্কুল-কলেজে পড়াকালীন মামার মামলামোকদ্দমার কাগজপত্র আমাকে পড়তে হতো। তাঁর বলা বক্তব্য লিখতে হতো। মামা আমাকে পড়াশোনা করতে উৎসাহিত করতেন। আমি আইনজীবী সনদ পাওয়ার পর ঢাকার একটি লাইব্রেরি থেকে মামা আমাকে আইনের অনেক বই কিনে দেন। মামা তাঁর মোকদ্দমা পরিচালনায় আমাকে সম্পৃক্ত করতে ও উৎসাহ দিতে তাঁর পক্ষে ওকালতনামা দিলে আমি আদালতে মোকদ্দমা শুনানির সুযোগ পাই। আমার সিনিয়র আবু হাসান আব্দুল্লাহ আমাকে শুনানি করার সুযোগ দিতেন। আমি সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতির বিভিন্ন পদে যখনই নির্বাচন করি, মামা আমাকে উৎসাহিত করতেন। তিনি রাত জেগে ভোটের ফলাফলের অপেক্ষা করতেন। আমার বিজয়ে তিনি আনন্দিত হতেন। প্রায় সময় আমাকে মামার সঙ্গে মোকদ্দমার কাজে সুনামগঞ্জে ও ঢাকায় যেতে হতো। সে সুবাদে তাঁর পাশে বসার সুযোগে তাঁর কাছ

থেকে তাঁর জীবনের অতীত কাহিনি ও অভিজ্ঞতা মনোযোগ দিয়ে শুনতাম। একটা জিনিস খেয়াল করেছি, তিনি সময়ের প্রতি খুবই গুরুত্ব দিতেন। কোথাও যাওয়ার নির্ধারিত সময়ের আধা ঘণ্টা আগে প্রস্তুত হতেন।

মামলার প্রেক্ষাপট ও আইনি লড়াই

মামাদের বাড়ির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে মসজিদ, পূর্বদিকে পুকুর, তৎপূর্বে দিঘি ও কবরস্থান। তাঁদের বাড়ির উত্তরে খাঁ-র বাড়ি। খাঁ-র বাড়ির সাথে মামাদের অনেক পূর্ব হতে বিরোধ ছিল। মূলত বাড়ির সামনের দিঘির দখল নিয়ে বিরোধ হতো। তারা দিঘিটি এককভাবে তাদের নিজের দাবি করতেন। মামারা মানতেন না। এই নিয়ে আব্দুল মুনীর খান মামাকে ১ নম্বর প্রতিপক্ষ করে অনেকের বিরুদ্ধে সুনামগঞ্জ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে দেওয়ানি কার্যবিধির ১৪৪ ধারার অভিযোগ এনে সিআর ৯৮৬/৭৪ নম্বর মামলা দায়ের করেন। মামলার তদন্ত প্রতিবেদনে বিষয়টি দেওয়ানি সংক্রান্ত থাকায় দেওয়ানি মামলা ছাড়া নিষ্পত্তি হবে না মর্মে তদন্তকারী কর্মকর্তা উল্লেখ করেন। অতঃপর মুহিব উদ্দিন খাঁন মামাকে ১ নম্বর বিবাদি করে অনেকের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দণ্ডবিধি আইনের ৪৩৬ ধারায় মিথ্যা অভিযোগে ০৫/০২/১৯৭৫ খ্রি. তারিখে ১ম শ্রেণির হাকিম আদালত সুনামগঞ্জ, সিলেট কোর্টে সিআর ১৫৫/১৯৭৫ মামলা দায়ের করেন। এই মামলা আদালতে প্রমাণিত না হওয়ায় তা না-মঞ্জুরক্রমে আদালত বিবাদিদেরকে দণ্ডবিধি আইনের ২০৯ ধারামতে অব্যাহতি দেন। এভাবে আরও বিভিন্ন ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ড চলতে থাকলে এবং বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করলে মেজ মামা তাদের বংশের সকলের অনুমতি নিয়ে সকলের সম্মতিতে তিনি নিজে ১ নম্বর বাদি হয়ে আব্দুল মুতলিব খাঁ গং বিবাদিদের বিরুদ্ধে ১৩৪ স্বত্ব বাঁটোয়ারা মোকদ্দমা ১৯৭৫ খ্রি. সাব জজ ১ম আদালত, সিলেট-এ দায়ের করেন। এই মোকদ্দমা পরবর্তীকালে যুগ্ম জেলা জজ সুনামগঞ্জ আদালতে স্বত্ব ৮৫/৮৫ খ্রি. নম্বরভুক্ত হয়ে বিচারকার্য পরিচালিত হয়। এই মামলায় তিনি বাদি পক্ষে পরিচালক হিসাবে ছিলেন। তাঁর ধ্যান, জ্ঞান, সময় শুধু এই মামলাকে কেন্দ্র করে চলত। তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, তাঁরা অর্থাৎ, বাদিগণ ও মোকাবিলা বিবাদিরা আকুব খাঁ তালুকের বৃহৎ অংশের মালিক এবং প্রকৃত মিরাশদার।

বাদিপক্ষের আরজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

'নালিশী আকুব খাঁ তালুক'-এর মূল মালিক ছিলেন বাদী, ৩০-৩৩নং মোকাবিলা বিবাদীদের পূর্ববর্তী ইদু মোং, দুস্ত মোং, রফি, জরিফ মোং, নজাত মোং ও ওয়েজ মোহাম্মদ। বিগত জরিপে নালিশা তালুকে এই ভূমির মূল মালিক হিসাবে তাহাদের নাম লিপিবদ্ধ হয়। এই তালুক জরিপ কালে দখলকার হিসাবে বাহাদুর খাঁ, রহিম খাঁ এবং বাদী ও ৩০-৩৩ নম্বর মোকাবিলা বিবাদীদের পূর্ববর্তী আজমত উল্লা, ফাজিল মোং, মাতাবদি, আরজান, হাজেরা বিবি, কামিল মোং, মোং নকি, বিশ্বম্বর শর্মা, ভূলানাথ শর্মা, গিরতাইন বিবি ও শামাল বিবি তুল্যাংশে স্বত্ববান ও দখলকার ছিলেন এবং তাহাদের ক্রমিক স্থলবর্তীগণ নিজ নিজ স্বত্বাংশে নালিশা ভূমিতে দখলকার হয়েছেন। বিশ্বম্বর শর্মা ও ভূলানাথ শর্মার ২/১৩ অংশ শত টাকা মূল্যে হস্তান্তর দ্বারা মূল দখলকার বাদী ও ৩০-৩৩ নম্বর মোকাবিলা বিবাদীদের পূর্বাধিকারী ফাজিল মামদ ও মাতাবদি মালিক হয়েছিলেন এবং সে মতে বাহাদুর খাঁ, রহিম খাঁ ব্যথিত অপর নয়জন ব্যক্তি ১১/১৩ অংশে স্বত্বাধিকারী ও দখলকার হয়েছিলেন। মূল বিবাদী নালিশা জমির মধ্যে তাঁর পূর্বাধিকারী বাহাদুর খাঁ ও রহিম খাঁর স্থলবর্তী হিসাবে মাত্র ২/১৩ অংশে স্বত্বাধিকারী হয়েছিলেন। তারা গোপনীয় কাগজী কারবারের মাধ্যমে জাল দলিল সৃজন করে নালিশা জমির অংশে দাবি উত্থাপন করছেন। বিগত ১৯৭৫ সনের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে বিবাদীগণ বাঁটোয়ারা করে দিতে অস্বীকার করায় এই মামলার কারণ উপজাত হয়। এপর্যায়ে বাদীগণ তাহাদের সাথে ৩০-৩৩ নম্বর মোকাবিলা বিবাদীগণ সহযোগে নালিশা ভূমি ১১/১৩ অংশ পৃথক ছাহাম পাওয়ার ও ছাহামের ভূমিতে দখল পাওয়ার প্রার্থনা করেন।'

বিবাদি পক্ষের লিখিত বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

এই মোকদ্দমার ১ ও ২ নম্বর বিবাদি বাদি পক্ষের দাবি অস্বীকার করে একটি লিখিত বক্তব্য প্রদান করেন। 'নালিশা তালুকের মালিক আকুব খাঁ মারা গেলে তদীয় ছেলে কামাল খাঁ, কামাল খার মৃত্যুতে তদীয় ছেলে লাল খাঁ, লাল খা মারা গেলে তদীয় ছেলে মনু খাঁ ও মনু খাঁ মারা গেলে তদীয় দুই ছেলে রহমত খাঁ ও জামাল খাঁ এই তালুকের স্বত্ববান ও দখলকার হন। অতঃপর রহমত খাঁ মারা গেলে তদীয় পুত্র বাহাদুর খাঁ

এবং জামাল খাঁ মারা গেলে তদীয় পুত্র আব্দুর রহিম খাঁ একমাত্র ওয়ারিশ হন। তৎপর আব্দুর রহিম খা একমাত্র পুত্র হাছন খাঁ কে একমাত্র স্থলবর্তী রাখিয়া মারা যান। হাছন খার মৃত্যুর পর দুই পুত্র ১/২ নম্বর বিবাদী ও তাঁর পাঁচ মেয়ে ও মেয়ের ওয়ারিশ ৩-১১ নম্বর বিবাদী ও স্ত্রী জুবেদা খাতুন মালিক হন। বাহাদুর খাঁ মারা গেলে তদীয় পুত্র আব্দুর রশিদ খাঁ ও মেয়ে নজিবুন নেছা মালিক হন।' তারা দাবি করেন যে, 'তালুকের কোনো ভূমিতে ১-১১ নম্বর বিবাদীগণ ছাড়া অন্য কাহারো কোনো ওয়ারিশ বা খরিদা কোনো এজমালি স্বত্ব নাই। বিশ্বম্বর শর্মা ও ভুলনাথ শর্মা নালিশা তালুকের কোনো খণ্ডের ভূমির মালিক ছিল না। তারা বিবাদীদের পূর্ববর্তী হতে খরিদা ক্রমে নালিশা তালুকের চিহ্নিত ভূমি প্রাপ্ত হয়। পরবর্তীকালে বিবাদীদের পূর্ববর্তী তাহাদের ক্রমিক উত্তরাধিকারী হতে এই ভূমি রেজিস্ট্রারি দলিল মূলে খরিদ করেন।' তারা উল্লেখ করেন, 'বাদীগণ কেউ বা তাহাদের পূর্বপুরুষ কেউ এই তালুকের মূল মালিক আকুব খাঁ বা তদীয় ক্রমিক ওয়ারিশান কাহারো নিকট হতে উত্তরাধিকারী সূত্রে বা অন্য কোনভাবে এজমালি স্বত্বাংশ বা জমি রসদ প্রাপ্ত হননি। বাদীগণ তথা মোকাবিলা বিবাদীগণ বা তাদের পূর্ববর্তী কাহারো কখনো বর্ণিত আকুব খাঁ তালুকে কোনো এজমালি বা পনিরসদে কোনো স্বত্ব স্বার্থ বা দখল ছিল না ও নাই।' তারা আরও উল্লেখ করেন, বাদিগণ তিনটি বিভিন্ন গ্রুপ বা গৌর পাট্টায় বা দলে বিভক্ত হন। ১-২৩ নম্বর বাদিদের পূর্বপুরুষ মো. কামিল এবং ২৫-২৭ নম্বর বাদিদের পূর্বপুরুষ মো. নাতির এবং ২৮ নম্বর বাদিনির পিতা মোং ছাতির পরস্পর সহোদর ভ্রাতা হন এবং তারা সকল একই গ্রুপ বা দলভুক্ত হন। এই দলের তৎকালীন প্রধান বা পরিচালক মোং ছাতির বিবাদিদের পূর্বপুরুষ মো. রহিম খাঁ হতে ১২৯৬ বাং ১৬ মাঘ তারিখে রেজিস্ট্রারি কবালা মূলে আকুব খাঁ তালুকের খণ্ড ভূমি যা বর্তমানে জরিপে ৩০১৫/ ৩০১৬/ ৩০১৭ নম্বর দাগে বাড়ি বরন্ডী ডোবা হিসাবে জরিপ হয়েছে তা খরিদ করেন এবং এই বাদিগণ তাতে স্বত্ববান দখলকার হন। বাদিদের অপর বা '২য় গ্রুপের ২৯-৩২ নম্বর বাদিদের পূর্বপুরুষ আতা উল্লা এবং ২৪/৩৩-৪২ নম্বর বাদিদের পূর্বপুরুষ মাতাবদি সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। এই আতা উল্লা ও মাতাবদি একযোগে বিবাদিদের পূর্বপুরুষ বাহাদুর খাঁ ও রহিম খাঁ হতে ১২৭৭ বাং ১৭ পৌষ তারিখের রেজিস্ট্রারি কবালা মূলে আকুব খাঁ তালুকের খণ্ড মূলে যা বর্তমান জরিপে

৩০১১ ও ৩০৩২ নম্বর দাগে বাড়িয়ান হিসাবে জরিপ হয়েছে তা খরিদ করেন এবং এই বাদিগণ ১-৯ নম্বর বাদিগণ শামিলে তাতে স্বত্ববান ও দখলকার হন। বাদিদের অপর বা ৩য় গ্রুপের ৪৩-৫৪ নম্বর বাদি পক্ষের প্রধান পরিচালক ফজলুর রহমান তদীয় স্ত্রী আলিবুন্নেছার নামে বর্ণিত আকুব খাঁ তালুকের একখণ্ড ভূমি যা বর্তমান জরিপে ৩০৩৬ দাগে লিপি হয়েছে তা ১/২ নম্বর বিবাদি হতে ১৩৫৮ বাং রেজিস্ট্রারি কবালা মূলে খরিদক্রমে এই বিবাদিদের পূর্ববর্তীর সাবেক খরিদা খণ্ড ভূমি অর্থাৎ, বর্তমান জরিপি ৩০৪৬ নম্বর দাগের বাড়ি শামিলে এই সকল বাদীগণ তাতে স্বত্ববান দখলকার আছেন। তারা আরও উল্লেখ করেন যে, বাদিদের মধ্যে কেউ কেউ ধনে জনে বলীয়ান হয়েছেন। তাদের গৌরব বৃদ্ধির জন্য এবং নিজ নিজ বাড়ির ও পরিবারিক মর্যাদা বর্ধন করার অভিপ্রায়ে ৩০২৬ নম্বর দাগের দিঘিতে অংশীদার হওয়ার খায়েশ ও অভিপ্রায় প্রকাশ এবং এই দিঘির কিছু অংশ তাদের নিকট বিক্রয় করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী বিবাদিগণকে অনুরোধ করেন। কিন্তু তারা এতে রাজি না হওয়ায় বিভিন্ন ফৌজদারি মামলার উদ্ভব হয়।

তারা আরও উল্লেখ করেন, 'তাহাদের পূর্বপুরুষগণের নামের অতিরিক্ত যে সকল নাম থাকের ওয়াজিবুল আরজে দখলকার স্বরূপ লিখিত আছে তারা কাহারো এই আকুব খাঁ তালুকে এজমালি বা পনি রসদে এই স্বত্ব বা দখল ছিল না এবং তাহাদের পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কেউ ঐরূপ কোনো স্বত্ব বা দখল দাবি করতে অধিকারী নহেন।'

তারা আরও উল্লেখ করেন, 'বাদীগণ বা তাহাদের পূর্ব পুরুষগণ বর্ণিত খরিদা সূত্রে নিজ নিজ খণ্ড ভূমির সীমিত স্বার্থবান থাকিয়া স্বত্ববান ও দখলকার হন। তারা কেউ তালুকের কোনো এজমালী অংশ কখনো খরিদ করেননি বা অপর কোনো ভূমিতে স্বত্ববান নহেন। বাদীগণ অন্যায় মতে দখলকার বলে লিখিত ১৩ জন ব্যক্তিকে সমান অংশে মালিক দখলকার আখ্যা দিয়ে মিথ্যা বয়ান জারিতে এই মোকদ্দমা দায়ের করেছেন। বাদীগণ কেউ তালুকের সাকুল্য ভূম্যাদি বাঁটোয়ারা হওয়ার কোনো দাবি করতে অধিকারী নহেন।'

বিবাদিদের দাবি মতে 'আকুব খাঁর পরবর্তী ওয়ারিশ হিসাবে তারা নালিশা তালুকের ভূমি এককভাবে মালিক দখলকার এবং ইহাতে বাদীদের

বা অন্য কোনো বিবাদীর কোনো এজমালি স্বত্ব নাই।' পক্ষান্তরে বাদিদের দাবি মতে থাক জরিপে দখলকারীরা নালিশা ভূমিতে সমানাংশে মালিক দখলকার হয়ে তারা ওই ভূমি বিবাদিদের সাথে এজমালিতে ভোগদখল করছেন। বিবাদিগণ আরও দাবি করেন যে, 'বিবাদী বংশের সকলেই খাঁ এবং নালিশা গ্রামে খাঁ বংশ ছাড়া আর কেহ নাই।' এই বিবাদিদের পক্ষে মো. আব্দুল মুহিব খাঁন তাঁর জবানবন্দিতে বলেন যে, বিগত জরিপে দিঘি ও দিঘিরপার ১ নম্বর বাদি গং ষোলোটা এজমালি খতিয়ান প্রস্তুত করেন। এর বিরুদ্ধে মো. মুনীর খাঁ ১৯(১) ধারায় ২৬০ নম্বর আপত্তি দাখিল করেন। উভয় পক্ষের সাক্ষ্যপ্রমাণে আমাদের নামে একক খতিয়ানে রেকর্ড হয়। তিনি আরও বলেন, মোকদ্দমায় ৫২ নম্বর বাদির নাম থাকলেও তারা সকলে এই মামলা করেনি; বরং ১নম্বর বাদি এই মামলা করেছে। বিবাদি পক্ষের উক্ত রূপ বর্ণনা থেকে স্পষ্টত বোঝা যায়, বাদিগণ নালিশা তালুকের কিছু কিছু ভূমি তিনটি পৃথক গ্রুপে খরিদ করে সেখানে বসতি স্থাপন করেন এবং পরবর্তীকালে বিলেতে গিয়ে আর্থিকভাবে সচ্ছল হয়ে তাদের গৌরব বৃদ্ধির জন্য ও সামাজিক ও পারিবারিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য দিঘির জায়গা খরিদ করতে প্রস্তাব দিয়েছেন। মূল বিবাদিগণ ও তাদের পূর্ববর্তীদের এমন আপত্তিজনক মনোভাব ও আচরণ এবং আকুব খাঁ তালুকের একক মালিক ও মিরাশদার হওয়ার দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বিরুদ্ধে এই মোকদ্দমা দায়েরের কারণ ছিল।

প্রতিপক্ষের জেরায় রেদওয়ানুল হক

বাদি পক্ষের ১ নম্বর বাদি রেদওয়ানুল হক অত্যন্ত ধৈর্য ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে মোকদ্দমায় তাঁর জবানবন্দি ও জেরা প্রদান করেন। প্রতিপক্ষের আইনজীবী চার দিন তাঁকে জেরা করেন। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এবং সংযত থেকে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হন। সংক্ষেপে কিছু কিছু বিষয় উদ্ধৃত করছি। জেরায় তিনি বিবাদিদের পূর্ববর্তী হতে নালিশা তালুকসংক্রান্ত ৩০১৫, ৩০১৬, ৩০১৭ নম্বর দাগের জমি খরিদ করার বা তা বাড়ি হিসাবে রেকর্ড থাকার বক্তব্য অস্বীকার করেন এবং বলেন, এ সংক্রান্ত দলিল বানোয়াট বা নালিশা ভূমিসংক্রান্ত নয়। অনুরূপভাবে ৩০১১, ৩০৩২ নম্বর দাগের জমি খরিদ করার বক্তব্য অস্বীকার করেন এবং বলেন, এই দলিল নালিশা জমিসংক্রান্ত নয়। একইভাবে ফজলুর

রহমানের স্ত্রীর নামে ১/২ নম্বর বিবাদির নিকট হতে ৩০২৬ নম্বর দাগের ভূমি সাবেক খরিদা ৩০৪৬ নম্বর দাগের বাড়ি শামিলে থাকার বক্তব্যটি অস্বীকারপূর্বক এই দলিলটি নালিশা জমিসংক্রান্ত নয় মর্মে দাবি করেন। বিবাদিগণ বর্ণিত এই কথিত কবালাসমূহ সাক্ষ্যপ্রমাণে প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। জেরার শুরুতেই তাঁর উত্তর ছিল, আমি আকুব খা তালুকের বাঁটোয়ারা চাই। এই তালুকে আমার অর্থাৎ, ১ নম্বর বাদির একক অংশ কত তা আমি বলতে পারব না, আমরা একত্রে তেরো ভাগের এগারো অংশ দাবি করছি। তিনি বলেন, তালুক বন্দোবস্ত নবাবি আমলে হয়েছে, এর সন-তারিখ জানি না। এই তালুক আকুব খা-র নামে বন্দোবস্ত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ইদু খাঁ বলে কেউ নেই, ইদু মোহাম্মদ আছেন। ইদু মোহাম্মদের বাবার নাম জানা নেই। ইদু মোহাম্মদের পূর্ববর্তী ওয়ারিশ আছে, তবে নাম জানি না। তিনি আরও বলেন, 'ইদু মোহাম্মদ, দোস্ত মোহাম্মদ, রফি মোহাম্মদ, জরিপ মোহাম্মদ, ফয়েজ মোহাম্মদ ও ওয়েজ মোহাম্মদ অর্থাৎ, ওয়াজিবুল আরজের মালিকগণ আমার পূর্ববর্তী। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, আমরা বাদিগণ তাদের ওয়ারিশ। তিনি আরও বলেন, আমি এই ছয়জনের মধ্যে দোস্ত মোহাম্মদের অধস্তন ওয়ারিশ।

প্রতিপক্ষের আইনজীবী কর্তৃক জেরায় তাঁকে দুর্বল ও উত্তেজিত করার নানা চেষ্টা করা হলেও তিনি অত্যন্ত শান্ত ও ধীরস্থির থাকার চেষ্টা করেন। তিনি জেরায় আরও বলছিলেন, দোস্ত মোহাম্মদ মারা গেলে তাঁর দুই ছেলে মনু খা ও কামাল খা ওয়ারিশ থাকে। এই বিষয়ে আরও অনেক প্রশ্ন ছিল। তিনি বলেন, মনু খা-র ছেলে ছিলেন মৌলানা কাদির মোহাম্মদ, মাতাবদি, আতা উল্লাহ, হাফিজ মোহাম্মদ, মোহাম্মদ নকিব, মেহের আলী। তিনি বলেন, মনু খা-র এক মেয়ে ছিল, নাম স্মরণ নেই। এইভাবে পর্যায়ক্রমে তিনি প্রত্যেক ওয়ারিশের নাম বলতে সক্ষম হন। জেরার একপর্যায়ে তিনি বলেন, 'আমি সামান্য লেখাপড়া জানি। আমাকে আরজি দিলে পড়তে পারি। তবে এখন চশমা কাজ করে না বলে এখন পড়তে পারব না।' এমনিভাবে তাঁকে নার্ভাস করার অনেক চেষ্টা করা হলেও তিনি নার্ভাস হননি। একপর্যায়ে তিনি গর্বের সাথে বলছিলেন, 'আমরা বাদিগণ মিরাশদার; আমরা কাউকে কোনো দিন খাজনা দিইনি। শুধু সরকারকে

খাজনা দিয়েছি। সরকারকে আমরা কে কত জমির খাজনা দিয়েছি স্মরণ নেই। আমি নিজে কত রাজস্ব দিই তা বলতে পারি না। কারণ সকলে মিলে একত্রে খাজনা দিই।' তিনি জেরার শেষপর্যায়ে বলেন, 'আমি আমার ভাই লোকমানুল হক, সুলেমানুল হক মিলে অন্য বাদিদের নাম জাল করে মোকদ্দমা আনয়ন করেছি তা সত্য নয়। তিনি আরও বলেন, বাদিদের মধ্যে আমিসহ অনেকেই বিলাতে থাকি। বাদিদের মধ্যে ৩০/৩২ জন বিলাতে থেকে আয়-রোজগার করে। এই রোজগার দ্বারাই আমরা ধনবান ও বলবান হয়েছি তা সত্য নয়। আমরা বহু পূর্ব থেকে ধনবান।' তিনি আরও বলেন, 'বাড়ির সম্মুখে দিঘিতে আমরা টাকার বিনিময়ে অংশ চেয়েছিলাম বা তারা দিতে না চাইলে আমরা দিতে জোরপূর্বক দখলের প্রয়াসী হই বা এই কারণে বিবাদিগণ আমাদের বিরুদ্ধে সিআর ৬৮৬/১৯৭৪ নম্বার ফৌজদারি মামলা করে, তা সত্য নয়।' জেরায় তিনি আরও বলেন, 'ফজলুর রহমানকে ৩০ নম্বর মোকাবিলা বিবাদি করেছি। ফজলুর রহমানের বাবার নাম হচ্ছে হাজির মোহাম্মদ। ফজলুর রহমান তিন বৎসর আগে মারা গেছেন, তাঁর ওয়ারিশদের পক্ষ করেছি। তাঁর ওয়ারিশদের পক্ষ করিনি, তা সত্য নয়। দাখিলকৃত কাগজাত বানোয়াট, তা সত্য নয়। মিথ্যা বলবে না বলে অন্যান্য বাদি জবানবন্দি দিতে আসেনি—তা সত্য নয়। আকুব খাঁ তালুকে আমাদের উত্থাপিত দাবি মিথ্যা, তা সত্য নয়। আমাদের দাবি মালিকি স্বত্ব।' তিনি আরও বলেন, '১৯৭৫ সনের মার্চ মাসে আমি এই দেশেই ছিলাম। আমি বিবাদি আব্দুল মতলিব খাঁ, আব্দুল মনির খাঁ-এর কাছে বাঁটোয়ারার জন্য তলব তাগাদা দিতে গিয়েছিলাম। আমার সাথে অন্যরাও গেছেন। এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আলোচনার সময় বহু লোক ছিল। সাজিদ মিয়া প্রমুখ ছিলেন। সেই সময়ে যারা উপস্থিত ছিলেন তারা সকলেই মারা গেছেন। আমরা বাঁটোয়ারার জন্য কোনো দিন কোনো তলব করিনি বা আমাদের বাঁটোয়ারার কোনো দাবি নেই, তা সত্য নয়।'

মোকদ্দমার প্রাথমিক ডিক্রি

বাদি ও বিবাদি পক্ষে সাক্ষ্য সমাপ্ত হওয়ার পর যুক্তিতর্ক শেষে আদালত ৩০/১১/১৯৯৩ খ্রি. তারিখে প্রাথমিক রায় ও ০৬/০১/১৯৯৪ খ্রি. তারিখে ডিক্রি প্রদান করেন। আদালত তাঁর প্রদত্ত রায়ে বিস্তারিত আলোচনার

সিদ্ধান্তমতে বাদি পক্ষ তার দাবি প্রমাণে সমর্থ হয়েছে। তৎমতে সে প্রতিকার পেতে পারে উল্লেখপূর্বক আদেশ প্রদান করেন যে, 'অত্র মামলা দু'তরফা সূত্রে বিনা খরচে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী বিবাদীদের বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য বিবাদীদের বিরুদ্ধে এক তরফা সূত্রে প্রাথমিক ডিক্রি হইল। বাদীপক্ষ আরজী বর্ণিত তপশীলের ভূমিতে ৯/১৩ অংশে সরসে নিরসে বিভাগ বণ্টন পাইবে। পক্ষগণ অদ্য তারিখ হতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে আপসে বিভাগ বণ্টন করে লইবে। অন্যথায় বাদীর প্রার্থনা মতে আবশ্যকীয় কমিশনার ফি জমা দিয়ে একজন উকিল কমিশনার নিযুক্তক্রমে বিভাগ বণ্টন করে লইবে। উকিল কমিশনার বিভাগ বণ্টন কালে পক্ষগনের বর্তমান দখল যথাসম্ভব বজায় রাখার চেষ্টা করবেন।'

প্রাথমিক ডিক্রির বিরুদ্ধে বিবাদি পক্ষের আপিল

প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী বিবাদি পক্ষ যুগ্ম জেলা জজ আদালতের স্বত্ব ৮৫/১৯৮৫ মোকদ্দমায় প্রদত্ত রায়ে সন্তুষ্ট না হওয়ায় তারা সংক্ষুব্ধ হয়ে বর্ণিত স্বত্ব ৮৫/১৯৮৫ মোকদ্দমার রায় ও ডিক্রির বিরুদ্ধে সুনামগঞ্জ জেলা জজ আদালতে স্বত্ব আপিল নম্বর ৪/১৯৯৪ দায়ের করেন। এই আপিল স্থানান্তরিত হয়ে সুনামগঞ্জ অতিরিক্তি জেলা জজ আদালতে উভয় পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্রমে শুনানি শেষে ২৬/১১/১৯৯৭ খ্রি. তারিখে মঞ্জুর হয় এবং আপিল আদালত নিম্ন আদালতের স্বত্ব মোকদ্দমা নম্বর ৮৫/১৯৮৫ খ্রি.-এর রায় ও ডিক্রি খারিজ করেন।

বাদিগণ এই আপিল আদালতের রায় ও ডিক্রির বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে সিভিল রিভিশন নম্বর ৭৭৮/১৯৯৮ খ্রি. দায়ের করেন। এই সিভিল রিভিশন মোকদ্দমা উভয়পক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ২/১১/২০০২ খ্রি. তারিখে মঞ্জুর হয়। হাইকোর্ট বিভাগ নিম্ন আপিল আদালতের রায় বাতিল করেন এবং রুল অ্যাবসুলেট করেন অর্থাৎ, মূল মোকদ্দমার রায় ও ডিক্রি বহাল রাখেন।

সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের সিভিল রিভিশন নম্বর ৭৭৮/১৯৯৮ খ্রি.-এর রায়ের বিরুদ্ধে বিবাদিগণ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল নম্বর ৪৯২/২০০৩ দায়ের করেন। সুপ্রিম কোর্টে এই লিভ টু আপিল পিটিশন উভয় পক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্রমে ২১/০৭/২০০৩ তারিখে খারিজ (Dismissed) হয়।

সর্বোচ্চ আদালতে প্রাথমিক ডিক্রি বহাল অতপর...

সর্বোচ্চ আদালতে ৩০-১১-১৯৯৩ খ্রি. তারিখের প্রাথমিক ডিক্রি বহাল থাকে। বাদিগণ প্রাথমিক ডিক্রি অনুসারে আরজির তপশিল বর্ণিত ভূমিতে ৯/১৩ অংশে পৃথক ছাহাম আদালতের ডিক্রি অনুসারে পৃথক করে দেওয়ার জন্য একজন সরেজমিন তদন্তকারী অ্যাডভোকেট কমিশনার নিয়োগের আবেদন করেন। আদালত এই আবেদন মঞ্জুর করে ০১/১২/২০০৩ খ্রি. তারিখে একজন সিসি কমিশনার নিয়োগ দান করেন। এই কমিশনার উভয় পক্ষের কৌঁসুলি ও পক্ষগণকে নোটিশ প্রদান করে ১৪/১২/২০০৩ তারিখ থেকে ১৭/১২/২০০৩ তারিখে সরেজমিনে উপস্থিত থেকে কমিশনকার্য সম্পন্ন করেন এবং ১৩/০১/২০০৪ তারিখে যুগ্ম জেলা জজ ১ম আদালতে তদন্তের প্রতিবেদন দাখিল করেন।

এ অবস্থায় সুয়েব খান গং ১৩ জন দেওয়ানি কার্যবিধি আইনের ১ আদেশের ১০ বিধিমতে বিবাদি হিসাবে এই মোকদ্দমায় পক্ষভুক্ত হওয়ার জন্য ২৭/১০/২০০৪ তারিখে এক দরখাস্ত দাখিল করেন। বাদি পক্ষ এই দরখাস্তের বিরুদ্ধে ০৯/১১/২০০৪ তারিখে লিখিত আপত্তি দাখিল করে। আদালত উভয়পক্ষের শুনানি শেষে ০৯/১১/২০০৪ তারিখে বর্ণিত সুয়েব খান গংয়ের দাখিলকৃত দরখাস্ত না-মঞ্জুর করেন।

সুয়েব খান গং আদালতের ০৯/১১/২০০৪ তারিখে প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে দেওয়ানি কার্যবিধি আইনের ১১৫(২) ধারামতে জেলা জজ আদালত সুনামগঞ্জে সিভিল রিভিশন নম্বর ০১/২০০৫ দায়ের করেন। উভয়পক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেলা জজ আদালত শুনানি শেষে ১৬/০৬/২০০৫ তারিখে এই সিভিল রিভিশন মঞ্জুর করেন এবং যুগ্ম জেলা জজ ২য় আদালতের প্রদত্ত ০৯/১১/২০০৪ তারিখে আদেশটি বাতিলক্রমে আবেদনকারীদের শুনানির সুযোগ প্রদান করে রিভিশনটি নিষ্পত্তি করেন।

বাদিগণ এই আপিল আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে সিভিল রিভিশন নম্বর ২২৯২/২০০৫ দায়ের করেন এবং এই সিভিল রিভিশন মোকদ্দমা উভয়পক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ০১/০৮/২০০৬ তারিখে মঞ্জুর হয় এবং জেলা জজ আদালতের সিভিল রিভিশন ১/২০০৫ Set aside হয়; যুগ্ম জেলা জজ ২য় আদালতের ০৯/১১/২০০৪ তারিখের প্রদত্ত রায় ও আদেশ বহাল রাখেন।

চূড়ান্ত ডিক্রি

এই মোকদ্দমার প্রাথমিক ডিক্রি বহাল থাকায় যুগ্ম জেলা জজ ২য় আদালত স্বত্ব ৫/০৪ খ্রি. সাবেক স্বত্ব ৮৫/৮৫ খ্রি. মোকদ্দমা ১৫/০৩/২০০৭ তারিখে কমিশন প্রতিবেদনটি বিবাদি পক্ষের বিরুদ্ধে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা হলো মর্মে আদেশ প্রধান করেন এবং ২৫/০৩/২০০৭ তারিখে এই মোকদ্দমার ০৬/০১/১৯৯৪ তারিখের প্রাথমিক ডিক্রিটি এতদ্দ্বারা চূড়ান্ত ডিক্রি রূপে গণ্য করা হলো মর্মে আদেশ প্রদান করেন এবং দাখিলকৃত কমিশনারের প্রতিবেদন, স্কেচ ম্যাপ, ফিল্ড বুক, ছিটা চূড়ান্ত ডিক্রির অংশ বলে গণ্য হবে মর্মে আদেশ প্রদান করেন।

অতঃপর আদালত অবিলম্বে জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প দাখিলের জন্য বাদিপক্ষকে নির্দেশ প্রদানপূর্বক আদেশ প্রদান করেন। বাদিপক্ষে ১ নম্বর বাদি ও পরিচালক রেদওয়ানুল হক ২৪/০৬/২০০৭ তারিখে ডিক্রিদার হিসাবে স্বত্বজারি মোকদ্দমা নম্বর ০১/২০০৭ দায়েরক্রমে বিবাদি/দায়িক প্রতি দখলদেহী পরোয়ানা দাখিল করেন। বর্ণিত জারি মোকদ্দমা চলাকালীন ০৩/০৯/২০০৭ তারিখে বর্ণিত সুয়েব খান গং সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের ০১/০৮/২০০৬ তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে Civil Petition for leave to appeal no. ১২৪৯/২০০৭-এর ফটোকপি দাখিলক্রমে লিভ পিটিশন শুনানি ও নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত জারি মামলার পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত রাখার প্রার্থনা করলে আদালত এই স্বত্ব জারি মোকদ্দমা স্থগিত রাখেন। পরে সুপ্রিম কোর্টে বর্ণিত লিভ-টু-পিটিশন উভয় পক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্রমে শুনানি শেষে খারিজ হয়।

চূড়ান্ত ডিক্রি রদ ও রহিতের দাবিতে স্বত্ব আপিল দায়ের

সুপ্রিম কোর্টে এই লিভ-টু-পিটিশন উভয় পক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্রমে খারিজ হওয়ার পর বাদি/ডিক্রিদার পক্ষ যুগ্ম জেলা জজ ২য় আদালতের ০৯/১১/২০০৪ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশ বহাল থাকায় ২৫/০৩/২০০৭ তারিখে বাদিদের ডিক্রিপ্রাপ্ত ছাহামের ভূমির দখল সমঝে দেওয়ার জন্য আদালতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক ডিক্রি জারি কার্যক্রম

করার পক্ষে আদেশ দানের প্রার্থনা করেন। ওই তারিখে এই ডিক্রি-জারি কার্যক্রম ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে লালাউর রহমান গং এই মোকদ্দমার ৫২(ক) হতে ৫২(ঙ) নম্বর বাদিগণ আদালতের প্রদত্ত চূড়ান্ত ডিক্রি তৎসংশ্লিষ্ট কমিশনারের প্রতিবেদন, প্রস্তুতকৃত ছাহাম, ছিটা, নকশা বাতিলপূর্বক চূড়ান্ত ডিক্রি রদ-রহিতক্রমে জেলা জজ আদালতে স্বত্ব আপিল ১২০/২০০৭ মোকদ্দমা দায়েরসংক্রান্ত আপিলের মেমো ও স্বত্ব জারি ০১/২০০৭ মোকদ্দমার কার্যক্রম স্থগিত রাখার দরখাস্তের কপি দাখিল করলে আদালত এই স্বত্ব জারি মামলার কার্যক্রম স্থগিত করার আদেশ প্রদান করে।

বাদিপক্ষে ১নং বাদী ও পরিচালক রেদওয়ানুল হক জেলা জজ সুনামগঞ্জ আদালতের বর্ণিত স্বত্ব আপিল ১২০/২০০৭ মোকদ্দমা রক্ষণীয় নয় মর্মে আদালতে ২২/১১/২০০৭ তারিখে একখানা দরখাস্ত দাখিল করলে উভয়পক্ষে শুনানি শেষে এই দরখাস্তটি নাকচ হয়। এই নাকচ আদেশের বিরুদ্ধে বাদিপক্ষ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ১২৩০/২০০৮ নম্বর সিভিল রিভিশন মোকদ্দমা দায়ের করেন।

সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে বর্ণিত সিভিল রিভিশন উভয় পক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্রমে শুনানি শেষে ২৩/০৬/২০০৯ তারিখে নিম্ন আপিল আদালতের স্বত্ব আপিল ১২০/২০০৭ যথাশীঘ্র চার মাসের মধ্যে আবেদনকারীর দরখাস্ত বিবেচনাক্রমে নিষ্পত্তি করার আদেশ দেওয়া হয়। সেই মতে অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত, সুনামগঞ্জ ০২/১০/২০১৪ তারিখে যুগ্ম জেলা জজ ২য় আদালত কর্তৃক স্বত্ব ০৫/২০০৪ নম্বর মামলার প্রদত্ত গত ২৫/০৩/২০০৭ তারিখের চূড়ান্ত ডিক্রি হতে উদ্ভূত স্বত্ব আপিল নম্বর ১২০/২০০৭ মোকদ্দমা উভয় পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক শুনানি শেষে এই স্বত্ব আপিলটি দোতরফা সূত্রে বিনা খরচায় না-মঞ্জুর করেন এবং নিম্ন আদালত কর্তৃক ২৫/০৩/২০০৭ তারিখে প্রদত্ত চূড়ান্ত ডিক্রি বহাল রাখেন।

অতঃপর বাদি/ডিক্রিদার পক্ষ ১২/০৪/২০১৫ তারিখে স্বত্ব জারি ০১/২০০৭ নম্বর মোকদ্দমার কার্যক্রম পুনরায় শুরু হওয়ার প্রার্থনা করে। ওই তারিখে বর্ণিত লালাউর রহমান গং এই মোকদ্দমার ৫২ (ক) হতে ৫২(ঙ) বাদিগণ অতিরিক্ত জেলা জজ সুনামগঞ্জ আদালতের

০২/১০/২০১৪ তারিখের প্রদত্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে সিভিল রিভিশন নম্বর-৮৯৩/২০১৫ মোকদ্দমা দায়ের করেছেন মর্মে উল্লেখ করে নিম্ন আদালতের স্বত্বজারি মোকদ্দমা ০১/২০০৭-এর স্বত্ব জারি কার্যক্রম স্থগিত হওয়ার প্রার্থনা করলে আদালত স্বত্ব জারি ০১/২০০৭ মোকদ্দমার কার্যক্রম স্থগিত রাখেন।

সর্বোচ্চ আদালতে চূড়ান্ত ডিক্রি যথারীতি বহাল

হাইকোর্ট বিভাগে ০১/০২/২০২১ খ্রি. তারিখে এই সিভিল রিভিশন ৮৯৩/২০১৫ মোকদ্দমা উভয় পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক শুনানি শেষে হাইকোর্ট তাঁর প্রদত্ত রায়ে Rule Discharged করেন এবং স্থগিতাদেশ Vacate ক্রমে নিষ্পত্তি করেন। হাইকোর্ট বিভাগের প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে বর্ণিত লালাউর রহমান গং ৫২(ক) হতে ৫২(ঙ) নম্বর বাদিগণ সুপ্রিম কোর্টে আপিল বিভাগে সিভিল মিসেলিনিয়াস পিটিশন ১৪৯/২০২১ দায়ের করলে উভয় পক্ষের শুনানি শেষে তা ১২/০৬/২০২৩ তারিখে খারিজ হয় এবং এই খারিজ আদেশের পর বর্ণিত লালাউর রহমান গং এই মোকদ্দমার ৫২ (ক) হতে ৫২(ঙ) নম্বর বাদিগণ পুনরায় সুপ্রিম কোর্টে Restore-এর আবেদন করলে তা ৩০/১০/২০২৩ তারিখে শুনানি শেষে খারিজ হয়।

চূড়ান্ত নিষ্পত্তি-আদেশ

অতঃপর বাদি/ডিক্রিদার পক্ষ ১২/১১/২০২৪ তারিখে বর্ণিত স্বত্ব জারি ০১/২০০৭ মোকদ্দমার কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক সরেজমিনে দখল প্রদানের আদেশ দিতে আদালতে আবেদন দাখিল করেন। ১৯/০৩/২০২৫ ইংরেজি তারিখে তা শুনানি শেষে আদালত বর্ণিত স্বত্ব জারি মোকদ্দমার ১২/০৩/২০১৮ তারিখের আদেশের মর্মানুযায়ী এই জারি মামলার দখলদেহী কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের উপস্থিতিতে ২০/০৫/২০২৫ তারিখে দখলদেহী কার্যক্রম ও ২২/০৫/২০২৫ তারিখে দখলদেহী প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। সে অনুযায়ী এক উৎসবমুখর পরিবেশে ২০/০৫/২০২৫ তারিখে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, জগন্নাথপুর থানাপুলিশ ও সিসি কমিশনার সহযোগে এলাকার বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে আদালতের নাজির কোনোরূপ বাধাবিঘ্ন

ছাড়াই শান্তিপূর্ণভাবে দখলদেহী কার্যক্রম সম্পন্ন করেন এবং বাদি/ডিক্রিদার পক্ষে উপস্থিত বাদি/ডিক্রিদারদেরকে ডিক্রিকৃত ৯/১৩ অংশের ভূমি সরজমিনে দখল সমঝে দেন এবং যথারীতি ধার্য তারিখে তাঁর দখলদেহী প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করেন। আদালতের নাজিরের এই প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে মোকদ্দমার মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী বিবাদি বা অন্য কোনো বিবাদি কোনোরূপ আপত্তি উত্থাপন বা কোনো আপত্তি আদালতে দাখিল করেননি। বাদি/ডিক্রিদার পক্ষেও কোনোরূপ আপত্তি দেওয়া হয়নি। কিন্তু ৫২(গ) নম্বর খালিছুর রহমান ও ৫২(ঘ) নম্বর আসিদুর রহমান বাদি/ডিক্রিদার পক্ষে আপত্তি দাখিলপূর্বক এই জারি মামলায় ১৩/০১/২০০৪ তারিখের সিসি কমিশনারের রিপোর্ট, নকশা, ছাহাম, ছিটা ইত্যাদির বিরুদ্ধে ২৫/০৬/২০২৫ তারিখে এক লিখিত আপত্তি দাখিলক্রমে তা বাতিলসহ চূড়ান্ত ডিক্রি বাতিলের প্রার্থনা করেন। এই আপত্তি শুনানি শেষে আদালত ২৪/০৭/২০২৫ তারিখে সিসি কমিশনার ও নাজিরের উপস্থিতিতে পুনরায় আপত্তি শুনানির জন্য দিন ধার্য করেন। এই তারিখে ডিক্রিদার পক্ষ ও আপত্তিকারী ডিক্রিদার পক্ষের কৌঁসুলির বক্তব্য এবং নাজির ও সিসি কমিশনারের বক্তব্য শ্রবণপূর্বক আদালত এই মোকদ্দমা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করেন।

চূড়ান্ত নিষ্পত্তির আদেশ : আদালতের পর্যবেক্ষণ

চূড়ান্ত নিষ্পত্তি প্রদত্ত আদেশের পর্যালোচনায় আদালত উল্লেখ করেন, ‘এই জারি মোকদ্দমাসংক্রান্তে মূল স্বত্ব ০৫/২০০৪ নম্বর মোকদ্দমার চূড়ান্ত ডিক্রি ও তৎসংশ্লিষ্ট সিসি কমিশনারের প্রতিবেদন, ছাহাম, ছিটা ইত্যাদি বাতিলের প্রার্থনা করে ২৫/০৬/২০২৫ তারিখের আপত্তি দাখিলকারী ৫২(গ) নং বাদী খালিছুর রহমান ৪নং আপিল্যান্ট এবং ৫২(ঘ) নং বাদী আশিদুর রহমান ২নং আপিল্যান্ট হয়ে ০৫ জন আপিলকারী জেলা জজ আদালত সুনামগঞ্জ-এ স্বত্ব আপিল ১২০/২০০৭ দায়ের করেন। স্বত্ব আপিল ১২০/০৭ নং মোকদ্দমার মেমোর হেতুবাদে আপিলকারীগণ লিখিতভাবে যে বক্তব্য দাখিল করেছেন ৫২(গ)/৫২(ঘ) নং বাদীপক্ষ কর্তৃক এই স্বত্ব জারি মোকদ্দমায় ২৫/০৬/২০২৫ইং তারিখের দাখিলীয় লিখিত আপত্তির বক্তব্য এক ও অভিন্ন মর্মে প্রতীয়মান

হয়। স্বত্ব আপিল ১২০/২০০৭ মোকদ্দমাটি অতিরিক্ত জেলা জজ আদালতে বদলী হওয়ার পর শুনানি হয়ে ০২/১০/২০১৪ নং তারিখের রায়ে স্বত্ব আপিল ১২০/২০০৭ নং মোকদ্দমাটি দো-তরফার সূত্রে নামঞ্জুর করে ২৫/০৩/২০০৭ নং তারিখের স্বাক্ষরিত চূড়ান্ত ডিক্রি বহাল রাখেন। চূড়ান্ত ডিক্রি বহাল থাকা মানেই সি.সি কমিশনারের রিপোর্ট, ছাহাম, ছিটা ইত্যাদি বহাল থাকা। স্বত্ব আপিল ১২০/২০০৭ মোকদ্দমার ০২/১০/২০১৪ তারিখের রায়ে আপিল আদালত উল্লেখ করেন যে, 'সিসি কমিশনারের গত ১৩/০১/২০০৪ নং তারিখের প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তিনি প্রাথমিক ডিক্রি মোতাবেক বাদীপক্ষের ছাহামপ্রাপ্ত ৯/১৩ অংশে ২২.৭২ একর জমিতে বাদীপক্ষকে ছাহাম প্রদান করেছেন। কোন বাদীকে পৃথক কোন ছাহাম প্রদান করেননি এবং কোন বিবাদী বা কোন তৃতীয় ব্যক্তির অনুকূলে কোন ছাহাম প্রদান করেননি।" কমিশনার তাঁর প্রস্তুতকৃত ছাহাম লিস্টের মন্তব্য কলামে উল্লেখ করেন, 'রায় ডিক্রিতে উল্লিখিত ৩৫.৯০ একর ভূমির স্থলে ৩২.৮২ একর ভূমি সরজমিনে প্রাপ্ত হয়েছেন এবং বাদীপক্ষের ছাহামপ্রাপ্ত ৯/১৩ অংশে ২২.৭২ একর ভূমি ছিটায় বর্ণিত দাগুলো দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। সুতরাং কমিশন রিপোর্টে, ছাহাম লিস্ট, ছিটা, নক্সা ইত্যাদি পর্যালোচনায় এটি স্পষ্ট যে, কমিশনার কোনো নির্দিষ্ট বা কোনো নির্দিষ্ট বিবাদীর অনুকূলে আলাদা কোনো ছাহাম প্রদান করেননি।'

আদালত তাঁর পর্যালোচনায় উল্লেখ করেন, স্বত্ব আপিল ১২০/২০০৭ মোকদ্দমার ০২/১০/২০১৪ তারিখের রায়/ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল্যান্ট ১) লালাউর রহমান, ২) আশিদুর রহমান (৫২-ঘ) নম্বর বাদি, ৩) আবিদুর রহমান, ৪) খালিছুর রহমান (৫২-গ) নম্বর বাদি একত্রে দরখাস্তকারী হয়ে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগে সিভিল রিভিশন ৮৯৩/২০১৫ মোকদ্দমা দায়ের করেন। এই সিভিল রিভিশনে মোকদ্দমাটি শুনানি অন্তে হাইকোর্ট বিভাগ ০১/০২/২০২১ তারিখে রায় প্রদান করেন। হাইকোর্ট বিভাগের সিভিল রিভিশন ৮৯৩/২০১৫নং মামলার ০১/০২/২০২১ তারিখের রায় নিম্নরূপ–

> It is ordered and deereed that the Rule is discharged without any order as to cost. And it is further ordered that the order of stay granted at the time of issuance of the rule is hereby re-called and vacated.

হাইকোর্টের ০১/০২/২০২১ তারিখের রায়ের বিরুদ্ধে দরখাস্তকারী-আপিল্যান্ট লালাউর রহমান গং সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে সিভিল মিসেলিনিয়াস পিটিশন ১৪৯/২০২১ নম্বর দায়ের করেন। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ১২/০৬/২০২৩ তারিখে এই ১৪৯/২০২১ সিভিল মিসেলিনিয়াস পিটিশন মামলায় নিম্নরূপ আদেশ প্রদান করেন–

> No one appears on behalf of the petitioners to press the petition. The petition is dismissed for default.

আদালতের এই আদেশের পর দরখাস্তকারী পক্ষের প্রার্থনায় পুনরায় ৩০/১০/২০২৩ তারিখে এই সিভিল মিসেলিনিয়াস ১৪৯/২০২১ নম্বর পিটিশনটি সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের ফুল বেঞ্চে শুনানি হলে আদালত নিম্নলিখিত আদেশ প্রদান করেন—

> 'This is an application for restoration of the instant civil miscellaneous petition No. 149 of 2021. Having heard the learned Counsels for both the parties and on perusal of the application, we do not find any cogent reason for allowing the application. Hence, the application for restoration is rejected.'

এই দরখাস্তের আপত্তি শুনানিকালে ৫২(গ) ও ৫২(ঘ) নম্বর বাদিপক্ষের কৌঁসুলি ল অব-পার্টিশন স্যুটের ৪৩৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আইনের ধারা মোতাবেক চূড়ান্ত ডিক্রি ও সিসি কমিশনারের রিপোর্ট, ছাহাম ছিটা বাতিলের নিবেদন করেন। এই জারি মোকদ্দমার দরখাস্ত ও মূল মামলার নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কমিশনার রিপোর্ট, নকশা, ছাহাম, ছিটা ইত্যাদি ১৩/০১/২০০৪ তারিখে দাখিলের পর বিবাদিপক্ষ লিখিত আপত্তি দাখিল করে। দীর্ঘদিন আপত্তি শুনানি পর্যায়ে অতিবাহিত হওয়ার পর আপত্তি শুনানি না করায় দীর্ঘ ৩ বছরেরও সময় পর অর্থাৎ, ২৫/০৩/২০০৭ তারিখের আদেশমূলে কমিশন রিপোর্ট গ্রহণ করা হয় এবং প্রাথমিক ডিক্রি চূড়ান্ত করা হয়। এছাড়াও আপত্তিকারী ৫২(গ), ৫২(ঘ) নম্বর বাদিপক্ষ এই কমিশন রিপোর্টি, ছাহাম লিস্ট, ছিটা ইত্যাদি তথা চূড়ান্ত ডিক্রি বাতিলের জন্য স্বত্ব সুনাম জেলা জর্জ আদালতের স্বত্ব আপিল ১২০/২০০৭, হাইকোর্টে সিভিল রিভিশন ৮৯৩/২০১৫ ও সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে সিভিল মিসেলিনিয়াস ১৪৯/২০২১ দায়ের করলে

দরখাস্তকারী পক্ষ তাদের দাবি প্রমাণ করতে না পারায় তাদের দায়েরি প্রত্যেকটি মোকদ্দমাই নামঞ্জুর/খারিজ হয় এবং চূড়ান্ত ডিক্রিসহ কমিশনার রিপোর্ট, ছাহাম, ছিটা ইত্যাদি বহাল রাখা হয়। পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্টসহ উচ্চ আদালতে মামলাটি নিষ্পত্তি হওয়ার পর এই আদালতের আদেশে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, জগন্নাথপুর থানাপুলিশ ও সিসি কমিশনার সহযোগে আদালতের নাজির সরেজমিনে গত ২০/০৫/২০২৫ তারিখে দখলদেহী কার্যক্রম সাক্ষীদের সম্মুখে যথাযথভাবে সম্পাদন করে যে প্রতিবেদন দেন তাতেও উল্লেখ আছে যে, তিনি ডিক্রিদার পক্ষকে ডিক্রিকৃত ভূমি সরেজমিনে দখল সমঝে দিয়েছেন এবং ডিক্রিদার পক্ষে ২, ৩, ১৩, ১৭ ও ২১ নম্বর ডিক্রিদার পক্ষ তা গ্রহণ করে দখলদেহী পরোয়ানায় স্বাক্ষর করেছে। নাজির কোনো একক ডিক্রিদারকে দখল প্রদান করেননি। নাজিরের দখলদেহী কার্যক্রমে কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়নি। তাছাড়াও দখল প্রদান কার্যক্রমের বিরুদ্ধে ডিক্রিদার পক্ষের কোনো আপত্তি নেই মর্মে ডিক্রিদার পক্ষের কৌঁসুলি শুনানিকালে নিবেদন করেন। যেহেতু ডিক্রিদার পক্ষকে ডিক্রিকৃত ভূমির দখল সরেজমিনে ২০/০৫/২০২৫ তারিখ আদালতের আদেশে সমঝে দেওয়া হয়েছে এবং সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত উচ্চ আদালতে মামলাটি নিষ্পত্তি হয়েছে, তাই এপর্যায়ে এই ৫২(গ) ও (ঘ) নম্বর বাদী/ডিক্রিদার পক্ষের দাখিলকৃত আবেদনটি শুনানি করার আইনত সুযোগ নেই মর্মে এই আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়।

সার্বিক পর্যালোচনা ও আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ৫২(গ) ও ৫২ (ঘ) নম্বর বাদিপক্ষের ২৫/০৬/২০২৫ তারিখের দাখিলকৃত আপত্তিটি অগ্রহণযোগ্য এবং এই জারি মোকদ্দমাটি পূর্ণসন্তুষ্টিতে নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে অভিমত প্রদান করে আদালত এই মোকদ্দমায় আদেশ প্রদান করেন :

> ‘৫২(গ) ও ৫২(ঘ) নম্বর বাদী/ডিক্রিদার পক্ষের ২৫/০৬/২০২৫ তারিখের আপত্তি অগ্রাহ্য করা হলো। এই স্বত্ব জারি ০১/২০০৭ নম্বর মোকদ্দমাটি এতদ্বারা পূর্ণসন্তুষ্টিতে নিষ্পত্তি করা হলো।’

চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতে কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নপূরণ

এই মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতে বাদি/ডিক্রিদার পক্ষকে দীর্ঘ ৫০ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। নানান বাধা-আপত্তি অতিক্রম করতে হয়েছে।

মোকদ্দমার ১ নম্বর বাদি ও পরিচালক রেদওয়ানুল হক চূড়ান্ত ডিক্রি দেখে যেতে পেরেছেন, কিন্তু চূড়ান্ত নিষ্পত্তি দেখে যেতে পারেননি। তিনি স্বত্ব জারি ০১/২০০৭ মোকদ্দমা দায়ের করেছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় মোকদ্দমার সরেজমিনে কমিশন চলাকালে সিসি কমিশনারের স্থানীয় নোটিশে বাদিদের পক্ষে ৫২(ক) বাদি লালাউর রহমান স্বাক্ষর প্রদান করেছিলেন। অথচ স্বত্ব আপিল ১২০/২০০৭ মোকদ্দমার মেমো অব আপিলে আপিলকারীগণ মোকদ্দমার চূড়ান্ত ডিক্রি ও তৎকালীন অবস্থা এবং সরেজমিনে কমিশন ও কমিশনারের প্রতিবেদন ইত্যাদি বিষয়ে কিছু না জানা সম্পর্কে কতিপয় বক্তব্য উল্লেখ করেন, যা খুবই দুঃখজনক। বাদি বাদির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ কতটা আত্মঘাতী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যার ফলে ২০০৭ হতে ২০২৫ খ্রি. পর্যন্ত দীর্ঘ ১৮ বছরেরও বেশি সময় এই মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি বিলম্বিত হয়েছে। আগেই উল্লেখ করেছি, এই মোকদ্দমা দায়েরের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাদিগণ ও মোকাবিলা বিবাদিগণ আকুব খাঁ তালুকের ১১/১৩ অংশের মালিক ও মিরাশদার—এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু বিচারান্তে বাদিগণ আকুব খাঁ তালুকে ৯/১৩ অংশের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেও তাদের খরিদকৃত ২/১৩ অংশের মালিকানা সম্পর্কে দালিলিক বা অন্য কোনো সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করতে পারেননি। তারপরও বাদিপক্ষ আদালতের প্রদত্ত রায় পূর্ণ সন্তুষ্টিচিত্তে গ্রহণ করেন। এই মোকদ্দমা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ফলে বাদি ও বিবাদিদের মধ্যে বিদ্যমান দীর্ঘদিনের বিরোধের চূড়ান্ত অবসান ঘটে। যদিও বিবাদিগণ কৌশলগতভাবে ১ নম্বর বাদিসহ কয়েকজন বাদিকে অন্যান্য বাদি থেকে পৃথক করার চেষ্টা করেছেন। এই মোকদ্দমায় কোন বাদি কত অংশ পাবে তা বিবেচ্য ছিল না। আদালত বাদিদের ৯/১৩ অংশ সম্পর্কে যে রায় ও ডিক্রি প্রদান করেন তা ছিল বাদিদের এক অনন্য পাওয়া। কিন্তু সে উপলব্ধি ৫২(ক) হতে ৫২(ঙ) নম্বর বাদিদের ছিল না।

এ মামলার ১ নম্বর বাদি ও পরিচালক রেদওয়ানুল হক আমার মেজ মামা তাঁর বংশকে নিয়ে গর্ব করতেন। তিনি বাদিদের পক্ষে দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ে তাঁর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ও স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন। তিনি তাঁর বংশের হৃত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। তিনি আজ বেঁচে নেই। তিনিসহ মোকদ্দমার বাদিদের মধ্যে যাঁরা আমাদের মধ্যে বেঁচে

নেই, তাঁদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি এবং তাঁদের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি।

মামলা-পরিচালনা : কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

পরিশেষে বাদিপক্ষে মোকদ্দমা পরিচালনায় যে সকল বিজ্ঞ আইনজীবী ছিলেন তাঁদের মধ্যে সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল ও সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট মাহমুদুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট মো. ফজলুল হক, অ্যাডভোকেট এমএ জব্বার, সিলেট জজ কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট আবু হাসান আব্দুল্লাহ, অ্যাডভোকেট হাফিজুর রহমান চৌধুরী, সুনামগঞ্জ জজকোর্টের সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট রফিকুল বারী চৌধুরী, অ্যাডভোকেট এ. জেড. এম. আজাদ বখত, অ্যাডভোকেট আলহাজ আলী আহমদকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি এবং তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি নিজে এই মোকদ্দমা পরিচালনায় সম্পৃক্ত থাকতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। এই মোকদ্দমায় বাদি পক্ষে আরজি প্রস্তুত করেন সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট মকবুল হোসেন। তাঁকে সহযোগিতা করেন সিলেট জজ কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট রাধাকান্ত গুপ্ত এবং বিবাদি পক্ষের লিখিত জবাব প্রস্তুত করেন সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট সুবিমল কুমার দেব, তাঁকে সহযোগিতা করেন সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট জিতেন্দ্র নারায়ণ দেব। আমি তাঁদেরকেও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

লেখক : হোসেন আহমদ, অ্যাডভোকেট, সাবেক সাধারণ সম্পাদক, সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতি ও সাবেক অতিরিক্ত সরকারি কৌঁসুলি—জজকোর্ট, সিলেট;
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

RUFIA REDWAN TRUST

রুফিয়া রেদওয়ান ট্রাষ্ট এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

Aims and Objectives of
RUFIA REDWAN TRUST

- The prevention or relief of poverty in the Jogonnatpur area of Sylhet, Bangladesh, and any individuals originally associated with that region in the United Kingdom by providing grants, items and services to individuals in need and/or charities, or other organisations working to prevent or relieve poverty.
- To relieve poverty or financial hardship among refugees, asylum seekers, migrant workers, those who are destitute and/or poverty-stricken and their dependants living in Jogonnatpur area of Sylhet, Bangladesh and any individuals originally associated with that region in the United Kingdom by providing interpreting/translating/advocacy/ health/housing advice and education and financial support.
- The prevention or relief of poverty or financial hardship anywhere in the world by providing or assisting in the provision of education, training, healthcare projects and all the necessary support designed to enable individuals to generate a sustainable income and be self-sufficient.
- To prevent or relieve poverty through undertaking and supporting research into factors that contribute to poverty and the most appropriate ways to mitigate these.
- To prevent or relieve poverty by awarding a 'fair trademark' to products, the sale of which relieves the poverty of producers by ensuring they receive at least a fair price for their goods and advising such producers of the best ways in which to engage in the trading process.
- To relieve the poverty of young people by the provision of grants to enable them to participate in healthy recreational activities that they could not otherwise afford.

www.rrtgiving.co.uk

দিয়া

Swadeshe Probashe Kormoshadhok
Redwanul Hoque Smarakgrontho
By Syed Nahas Pasha
৳ 600.00 £10

ISBN : 978-984-29104-1-8